বিবিধপ্রবন্ধ।

("নবজীবন" এবং "ভারতী" হইতে পুনর্মুদ্রিত।)

শ্রীপ্রমথনাথ বসু-প্রণীত।

৫৪, নং কলেজষ্ট্রীট, কলিকাতা,
এস, কে, লাহিড়ি এবং কোম্পানি
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক
ভবনে ষ্টানহোপ যন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৯৯ সাল।

সূচীপত্র।

অশুদ্ধ-শোধন।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৩	১৪	দ্বিতীয়তঃ	তৃতীয়তঃ
২৫	১৫	তৃতীয়তঃ	চতুর্থতঃ
৪১	২	অল্প	অন্ধ
ঐ	১৮	ঐ	ঐ
৪৪	৫	লেণ্টা	লেপ্‌টা
৬৬	৫	নলির	পলির
ঐ	৬	নলি	পলি

হিন্দুধর্ম্মের নবজীবন।

আজকাল হিন্দুধর্ম্মের উপর নব্যবঙ্গের অতিশয় উৎসাহ দেখা যাইতেছে।

এই নবানুরাগের প্রধান কারণ, হিন্দুধর্ম্ম জাতীয় ধর্ম্ম। আমাদের জাতীয় জীবনের অঙ্কুর রোপিত হইয়াছে। সংবাদ-পত্রে, পুস্তকে, বক্তৃতায়, "সমুদায় ভারতবাসী একজাতি" ধ্বনিত—প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বিজাতীয় ধর্ম্ম, বিজাতীয় রীতিনীতির উপর বিরাগ, এবং জাতীয় ধর্ম্ম, জাতীয় আচার ব্যবহারের উপর অনুরাগ ক্রমশঃ প্রবল হইতেছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষাই যে আমাদের নবজীবনপ্রভাতের মূলীভূত কারণ, তাহা কোন্ অপক্ষপাতী বিচারক অস্বীকার করিবেন? সত্য বটে, আর্য্যেরা সভ্যতাসোপানের অনেক উচ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে বহুকালের কথা। তাঁহাদের উন্নতিসূর্য্য অনেক দিন অস্তমিত হইয়াছে। গত আটশত বৎসর ভারতবর্ষের পক্ষে গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন অমাবস্যা রজনী। আমাদের গণিতশাস্ত্র এবং দর্শন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যে খানে ছিল, আজও সেইখানে রহিয়াছে—একটুও অগ্রসর হয় নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে (বিশেষতঃ, গত দুই শত বৎসরে) পাশ্চাত্য জাতিরা প্রাচ্যদিগকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া উন্নতিবর্ত্মে অগ্রসর হইয়াছে। তাহাদিগের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে

আমাদের অপমান নাই, তাহারা যে আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ দিগের অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছে তাহা স্বীকার করিলে আমাদের গৌরবের হ্রাস হইবে না। গণিতবিদ্যা এবং রসায়ন আরবেরা হিন্দুদিগের নিকট শিখে আরবদিগের কাছে বর্ত্তমান ইউরোপীয়েরা শিক্ষালাভ করে কিন্তু আমাদের গণিত ও রসায়নের সহিত অধুনাতন ইউরোপীয় গণিত ও রসায়নের কত প্রভেদ, তাহা পাঠককে বলার প্রয়োজন নাই।

প্রভেদ স্বীকার করায় কোন অপমান দেখা যায় না। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যে আমাদের বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এক্ষণে আমাদের যাহা কিছু জীবনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে তাহা যে অনেকটা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার বলে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। প্রমাণ, যাহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা পায় নাই, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের, পাশ্চাত্য সভ্যতার ভাব যাহাদের মনে প্রবেশ করে নাই, তাহাদের মধ্যে নবজীবনের চিহ্ন অতি অল্পই দৃষ্ট হয়—তাহারা পূর্ব্বেও যেরূপ মৃতবৎ ছিল, এখনও সেইরূপ মৃতবৎ।

পাশ্চাত্য খণ্ডে যে বিজ্ঞান দ্রুতগতি উন্নতি-পথে ধাবমান হইতেছে, যে বিজ্ঞানের বলে আমাদের জাতীয় জীবনের সঞ্চার হইয়াছে, যাহা কিছু সেই বিজ্ঞানের প্রতিকূল তাহার পতন নিশ্চয়; যাহা কিছু উহার অনুকূল তাহাই রহিবে। ফ্রান্স, জর্ম্মাণ, ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশে অখ্রীষ্টিয়ানের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহার কারণ খ্রীষ্টান-ধর্ম্ম বিজ্ঞানের প্রতিকূল। ধর্ম্ম দ্বারা সচরাচর যাহা বুঝায়,

তৎসম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের অসামঞ্জস্য নাই। বিশ্বাস সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্মের উদারতা সম্পূর্ণ। তুমি এক ঈশ্বরের উপাসনা করিবে, হিন্দুধর্ম্ম তোমায় ক্রোড়ে লইবে। তুমি প্রতিমা পূজা করিবে, যেরূপ খুসী এবং যত খুসী প্রতিমা গড়িয়া পূজা কর, হিন্দুধর্ম্ম কখনও তোমায় বারণ করিবে না। হিন্দুধর্ম্ম পরিবর্ত্তনশীল, তাই উন্নতিশীল, তাই বিজ্ঞানের বিরোধী নহে, তাই ইহার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। "প্রাচীন এপিকিউরস, ডিমক্রিটস হইতে আধুনিক হক্সলি, টমসন, স্পেন্সার প্রভৃতি পুরুষ প্রধানেরা যে মহাশক্তির উপাসক *** সেই জগৎপ্রসূতি মহাদেবীর আরাধনা করিতে" * যে ধর্ম্ম উপদেশ দেয়, যে ধর্ম্মে বুদ্ধদেব অবতার মধ্যে গণ্য, যে ধর্ম্ম চার্ব্বাকাদি নিরীশ্বরবাদিদিগকেও আশ্রয় দেয় সে ধর্ম্মের বিনাশ অসম্ভব। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাণীবিদ্যার মূলসূত্র, জীবের ক্রম বিকাশ; ইহা প্রচারিত হইবামাত্র খ্রীষ্টানধর্ম্ম খড়্গহস্ত হইল, প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম জীবের ক্রম বিকাশ মত সাদরে গ্রহণ করিল, এমন কি কোন কোন পণ্ডিত হিন্দুশাস্ত্রে ঐ মতের অস্ফুট প্রকাশ দেখিতে পাইলেন। পৃথিবীর বয়স পরিমিত নহে, যুগের পর যুগ অতিবাহিত হইয়াছে, আধুনিক বিজ্ঞানের এই অখণ্ডনীয় সত্য খ্রীষ্টান-ধর্ম্মপুস্তকের বিরোধী। কিন্তু হিন্দুদিগের ধর্ম্মপুস্তকে এই সত্য পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত হইয়াছে।

কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম হিন্দু সমাজের সহিত অতিশয় জড়াইয়া পড়িয়াছে। হিন্দুদিগের সামাজিক নিয়ম ধর্ম্মের নামে প্রচলিত।

---

* "নবজীবন," পৌষ ৬ সংখ্যা। ৩৬৪ পৃষ্ঠা।

সামাজিক নিয়ম রক্ষা করিবে না, ধর্ম্মচ্যুত হইবে। ঐ সকল নিয়মের সহিত ধর্ম্মের বাস্তবিক কোন সম্বন্ধ নাই, উহাদের নাশে প্রকৃত ধর্ম্মের নাশ হইবে না। যদি উহাদের কোনটি উন্নতি-বিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে হিন্দুধর্ম্মের কোন ক্ষতি হইবে না। হিন্দু সমাজের পরিবর্ত্তন হইবে, সত্য, কিন্তু পরিবর্ত্তন উন্নতির সহচর। যাহা কিছু স্থায়ী তাহার উন্নতি অসম্ভব। প্রাণীজগতের ক্রমিক পরিবর্ত্তন হইয়া অপকৃষ্ট জীব হইতে উৎকৃষ্ট জীব উৎপন্ন হইয়াছে। সমগ্র জীবজগৎ যে নিয়মের বশবর্ত্তী, সমাজ বিশেষের পক্ষে সে নিয়ম অতিক্রম করা অসম্ভব। পরিবর্ত্তনশীল না হইলে ব্যক্তি বিশেষের ন্যায়, সমাজেরও উন্নতি সম্ভবে না।

আমরা যে সকল সামাজিক নিয়মের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলি বলিলাম, এই প্রবন্ধে তাহার প্রধান কয়টির অবতারণা করিব।

১। খাদ্যাখাদ্য বিচার। এই নিয়মটি কোন ক্রমেই হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ নহে। এখনকার ব্রাহ্মণেরা যাহা অখাদ্য বলিয়া মত দিয়া থাকেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা, তাঁহাদের ধর্ম্মের নেতারা, তাহা খাইতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আর্য্যেরা যে গোমাংস পর্য্যন্ত ছাড়িতেন না, তাহার প্রমাণ প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পাইয়াছেন। আবার, আজকালকার হিন্দুদিগের মধ্যেই, বঙ্গদেশে যাহা অখাদ্য মহারাষ্ট্রে তাহা খাদ্য, মহারাষ্ট্রে যাহা অখাদ্য বঙ্গদেশে তাহা খাদ্য। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের পক্ষে মৎস্যমাংস নিষিদ্ধ; বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ মৎস্য এবং ছাগশাবকের জন্য লালায়িত। মহারাষ্ট্রীয় শূদ্র এবং অনেক রাজপুত

নির্ব্বিবাদে গ্রাম্য কুক্কুটাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে, বঙ্গীয় শূদ্রের পক্ষে ভিন্ন নিয়ম। ফলতঃ প্রতিমাদি পূজা সম্বন্ধে যেরূপ, খাদ্য সম্বন্ধেও সেইরূপ হিন্দুধর্ম্মের আদেশ অলঙ্ঘনীয় নহে, স্বেচ্ছাপালনীয়। মহারাষ্ট্র এবং উত্তর পশ্চিমাঞ্চলবাসিরা যেরূপ দুর্গা পূজা না করিয়াও হিন্দু, বঙ্গীয় ব্রাহ্মণেরা সেইরূপ মৎস্য মাংস খাইয়াও হিন্দু। যদি মৎস্যাদি ভক্ষণ ব্রাহ্মণের পক্ষে বাস্তবিক নিষিদ্ধ হইত, তাহা হইলে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নামের অধিকারী হইতে পারিতেন না। অতএব দেখা যাইতেছে অখাদ্য ভক্ষণ সম্বন্ধে নিষেধ সামাজিক নিয়ম মাত্র। ধর্ম্মের সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই, যদি থাকে তাহা হইলে থাকা উচিত নহে। মৎস্য মাংস খাওয়া ভাল কি মন্দ, উহা ব্যতীত শারীরিক উৎকর্ষ সাধন সম্ভবপর কি না, সে বিষয়ে এখানে তর্ক বিতর্ক করিবার প্রয়োজন করে না। তবে খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে ধর্ম্মের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। খাদ্যাখাদ্যের বিচার বিজ্ঞান করিবে; বিজ্ঞানের মতানুসারেও চলা না চলা আমাদের ইচ্ছাধীন,—"আপ্‌রুচি খানা।" মাংস শরীরের পক্ষে উপকারী সিদ্ধান্ত হইলেও, অনেক করুণহৃদয় লোক উহাতে বিরত থাকিতে পারেন, মাংস সাধারণতঃ নিষিদ্ধ হইলেও, কাহারও কাহারও পক্ষে, উহা হইতে উপকার অসম্ভব নহে, এবং কখনও কখনও উহা ব্যতীত আর কোন খাদ্য না জুটিতেও পারে।

প্রকৃত পক্ষে, আজ কাল নব্য সম্প্রদায়ের অনেকেই হিন্দুধর্ম্মের খাদ্য সম্বন্ধের নিয়ম সহস্রাধিক বার লঙ্ঘন করিতেছে। কৈ, তাহারা ত ধর্ম্মচ্যুত হইতেছে না, যে হিন্দু সেই হিন্দুই রহিতেছে! তবে তোমার হিন্দুধর্ম্মের আদেশ কোথায়

রহিল? নব্য সম্প্রদায় ঐ আদেশ কেন মানেন না? কারণ, উহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ উহার প্রতিপালনে ব্যক্তিগত বা সমাজগত উন্নতি দৃষ্ট হয় না। কেহ কেহ বলিবেন, নব্য সম্প্রদায় অখাদ্য ভক্ষণ করিয়া থাকে বটে, কিন্তু তাহা 'অজ্ঞানত, গোপনে।' যাহা অকর্ত্তব্য তাহা কি গোপনে করিলে কোন দোষ হয় না? গোপনই বা কোথায়? অনেকে প্রকাশ্যরূপেই বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের অনেক অখাদ্য উদরস্থ করেন। কিন্তু অনেক সময়ে যে অনেককে কপটাচরণ করিতে হয়, মিথ্যা কথা বলিতে হয়, তাহা কে না জানে?—এ পাপের জন্য কি হিন্দু সমাজ কতকটা দায়ী নহে? যে আজ্ঞার ক্রমাগত লঙ্ঘন হইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আরও লঙ্ঘন হইবে, যে আজ্ঞার লঙ্ঘনকারীদিগকে সমাজ দণ্ড দিতে অসমর্থ, অথচ যে আজ্ঞা থাকা প্রযুক্ত অনেকের মন অনর্থক পাপে কলুষিত হইতেছে, যে আজ্ঞার অবহেলা বর্ত্তমান ঘটনা পরম্পরার অবশ্যম্ভাবী ফল; তাহা বজায় রাখিতে আজ্ঞা রক্ষা করা কি বিধেয়? চেষ্টা করা কি বাতুলের কার্য্য নহে? অতএব আমরা যত শীঘ্র আমাদের ধর্ম্মের খাদ্য অখাদ্য সম্বন্ধে নিয়ম উঠাইয়া দেই, ততই আমাদের ধর্ম্মের এবং সমাজের পক্ষে ভাল।

২। পোতারোহণে বিদেশ গমন বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মে বাস্তবিক নিষিদ্ধ কি না তাহা লেখক বিশেষরূপে অবগত নহেন। কিন্তু জাহাজে চড়িয়া ইউরোপে যাইলে "জাত যায়" তাহা সকলেই জানেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, যে "জাত যায়" জাহাজারোহণের জন্য নহে, "জাত যায়" অখাদ্য ভক্ষণের

জন্য। তাহা যদি হয়, তবে ঠিক ঐ সকল অখাদ্য যাঁহারা, এই দেশেই প্রকাশ্যেই হউক আর অপ্রকাশ্যেই হউক, খাইয়া থাকেন, তাঁহাদের "জাত যায়" না কেন? এ সমস্যা কে পূরণ করিবে? কয়েক জন হিন্দু, সমাজভুক্ত হিন্দু (তাঁহাদের মধ্যে আবার কেহ কেহ উপবীতধারী) পি এণ্ড ও কোম্পানির জাহাজে—জাহাজের টেবিলে, জাহাজের খাদ্য খাইয়া—মান্দ্রাজ বা লঙ্কাদ্বীপ যাইলেন, কিন্তু তাঁহাদের "জাত" গেল না। অতএব, দেখা যাইতেছে, যে হিন্দুধর্ম্মের আদেশ যাহাই হউক, জাহাজে করিয়া ইউরোপ যাওয়া হিন্দু সমাজের চক্ষে প্রায়শ্চিত্তসাপেক্ষ পাপ! এরূপ বিবেকহীন, সঙ্কীর্ণ নিয়ম যে প্রাচীন উন্নতিশীল হিন্দুদিগের ধর্ম্মে ছিল না, তাহার প্রমাণ, তাঁহারা বাণিজ্যার্থ সমুদ্রে গমনাগমন করিতেন। এরূপ নিয়ম যে আমাদের উন্নতির বিরোধী তাহা পাঠককে অধিক কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলে তাঁহার বুদ্ধির অপমান করা হইবে। ভারতবর্ষ ছাড়া যে অন্য দেশ আছে, হিন্দু ছাড়া যে অন্য সভ্য জাতি আছে, অনেকের পক্ষে তাহা জানা আবশ্যক। বিদেশ ভ্রমণে যে মনের সঙ্কীর্ণতা যায় এবং শিক্ষালাভ হয়, তাহা সকলেরই জানা আছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের নিকট এখনও বহুদিন আমাদিগকে নতশির হইয়া শিক্ষালাভ করিতে হইবে। ইউরোপে যে বিজ্ঞানসূর্য্য উদিত হইয়াছে, এখানে যাহার ঈষৎ আভা পাইয়া আমরা নবজীবন প্রাপ্ত হইয়াছি, ইউরোপে না যাইলে তাহার জ্যোতির সম্পূর্ণ উপলব্ধি অসম্ভব। আবার, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। ভারতবর্ষের বাণিজ্যের বিস্তার যে বিশেষরূপে বাঞ্ছনীয়, তাহা

কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু যতদিন পোতারোহণে ইউরোপ ও আমেরিকা গমন হিন্দু সমাজে নিষিদ্ধ থাকিবে, ততদিন আমরা ইচ্ছানুরূপ বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না, ততদিন ভারতবর্ষ গরিব থাকিবে। চারিদিকে শুনা যায়, আমাদের দেশে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার যন্ত্রের সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি পায় তাহার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু যন্ত্রাদি সম্বন্ধে শিক্ষা কে দিবে, কোথায় পাইব? তাহার জন্য কি ইউরোপে যাওয়া আবশ্যক নহে? জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ ধনাঢ্য হিন্দু বণিক কার্য্যবশতঃ ইংলণ্ডে যান। তিনি ম্যাঞ্চেষ্টার কি লিবরপুলে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে অতি গোপনে লণ্ডন দেখিতে যান—পাছে কোন বাঙ্গালির চক্ষে পড়েন। এখানে প্রচার ছিল, যে তিনি বোম্বাই গিয়াছেন। তাঁহাকে এরূপ নিগ্রহ সহ্য করিতে হইল কেন? এরূপ কপটাচরণ করিতে হইল কেন? লেখক, তাঁহার বিষয় যতদূর শুনিয়াছেন, তিনি একজন গণ্য, মান্য, উৎকৃষ্ট লোক, সহজে মিথ্যা কথা বলিবার লোক নহেন। হিন্দু সমাজের কুনিয়মই তাঁহাকে কুপথে যাইতে বাধ্য করিয়াছিল।

৩। বর্ণভেদ। বর্ণভেদের মূল হিন্দু সমাজে এমনি দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করিয়াছে, এবং এতদূর প্রসারিত হইয়াছে যে, উহাকে উৎপাটিত করা দুঃসাধ্য। অনেক দিন হইতে অনেক সমাজ সংস্কারক বর্ণভেদের বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তথাপি উহা সতেজ রহিয়াছে। বোধ হয়, তাহার একটি প্রধান কারণ, তাঁহারা হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছেন। না।—নূতন নাম ধরিয়া নূতন দল বাঁধিয়া, হিন্দু সমাজের দুই চারিটি ডাল কাটিয়া রোপণ

করিলে বিশেষ ফল দর্শিবে না। ডাল গজাইল; নূতন গাছ হইল; "জাতির" সংখ্যা বাড়িল মাত্র—হিন্দু সমাজের বর্ণভেদ যে সেই রহিল, কালে আরও বদ্ধমূল হইল। মিথ্যাকে সত্য করিতে চেষ্টা না করিয়া, কপটাচরণ না করিয়া, যথাসাধ্য হিন্দু সমাজের ভিতর থাকিয়া, বর্ণভেদের মূলে ক্রমাগত কুঠারাঘাত কর, কালে উৎপাটিত হইবেই হইবে।

আর্য্যেরা ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করিবার সময় অনেক স্থানে অনার্য্যদিগকে পরাজয় করেন। আর্য্যেরা বিজেতা, অনার্য্যেরা বিজিত; আর্য্যেরা সভ্য, অনার্য্যেরা অসভ্য; আর্য্যেরা গৌরবর্ণ, সুপুরুষ, অনার্য্যেরা কৃষ্ণ বর্ণ, কদাকার। এরূপ অবস্থায় পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যত্র যাহা ঘটিয়াছে, এবং অদ্যাপি ঘটিতেছে, ভারতবর্ষেও তাহা ঘটিয়াছিল,—আর্য্যে আনার্য্যে বর্ণভেদ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এখন? এখন আর্য্য, অনার্য্য অনেকটা মিশিয়া গিয়াছে, সকলেই কৃষ্ণবর্ণ; এখন আর্য্য অনার্য্য সকলেই বিজিত, পদানত। এখন এক নূতন গৌরবর্ণ, প্রভুত ক্ষমতাশালী জাতি হইতে, কি আর্য্য কি অনার্য্য সমুদয় ভারত সন্তান ভিন্ন বর্ণ। এখন আর আমরা কি বলিয়া বর্ণভেদ বজায় রাখি? সমুদায় ফ্রান্সবাসী যেরূপ একজাতি, সমুদয় ইংলণ্ডবাসী যেরূপ একজাতি, আমরা যদি সেইরূপ একজাতি হইতে চাই, তাহা হইলে বর্ণভেদ রক্ষা করিলে চলিবে না। সমুদয় ভারতবাসী একজাতি, সমুদয় ভারতবর্ষ আমাদের দেশ—ইহা নূতন এবং মহৎ ভাব। এখন আর ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে, শূদ্রে শূদ্রে, ব্রাহ্মণে শূদ্রে, বঙ্গে মহারাষ্ট্রে, মহারাষ্ট্রে পঞ্জাবে, বঙ্গে আসামে, বর্ণভেদ জনিত সঙ্কীর্ণ সম্বন্ধ

থাকা কি অসঙ্গত নহে? শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিম বাবু "নবজীবনে" মহাভারতাদি প্রাচীন গ্রন্থ হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, যে যথার্থ ব্রাহ্মণ গুণে, জন্মে নহে—গুণবান শূদ্র ব্রাহ্মণ, নির্গুণ ব্রাহ্মণ শূদ্র। যুধিষ্ঠির বলিতেছেন, "অনেক শূদ্রে ব্রাহ্মণ লক্ষণ, ও অনেক দ্বিজাতিতেও শূদ্র লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব শূদ্রবংশ্য হইলেই যে শূদ্র হয় এবং ব্রাহ্মণবংশ্য হইলেই যে ব্রাহ্মণ হয়, এরূপ নহে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তিতে বৈদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রাহ্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে না হয়, তাহারাই শূদ্র।" * অতএব আমাদের প্রস্তাব ধর্ম্মবিরুদ্ধ নহে—বরঞ্চ ধর্ম্মসঙ্গত।

বর্ণভেদ থাকা প্রযুক্ত যে কিরূপ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে, এখানে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিব। বর্ণভেদ সত্ত্বে—হিন্দুর পক্ষে বিদেশভ্রমণ এক প্রকার অসম্ভব। মনে কর, কেহ ইউরোপে যাইবে; তাহাকে শ্রেষ্ঠবর্ণের বা সবর্ণের পাচক সঙ্গে লইতে হইবে। পাচক লইবার সঙ্গতি নাই, সে কি করিবে? পাচক লইলেও অনেক স্থলে হিন্দু সমাজের নিয়মানুসারে রন্ধন করা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

বর্ণভেদ থাকিতে হিন্দু ধর্ম্মের বল বৃদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। যদি ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী কেহ হিন্দু ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণেচ্ছুক হয়, হিন্দু ধর্ম্ম কেন না তাহাকে আশ্রয় দিবে? প্রকৃত পক্ষে বৌদ্ধ ধর্ম্ম হিন্দু ধর্ম্মের শাখা মাত্র; বৌদ্ধদিগকে হিন্দুর মধ্যে গণ্য করায় হিন্দু ধর্ম্মের কোন ক্ষতি নাই, বরঞ্চ লাভেরই সম্ভাবনা।

---

* "নবজীবন," মাঘ, ৭ সংখ্যা ৪৯৭ পৃষ্ঠা।

জ্ঞানালোক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণভেদের বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া যাইতেছে। আজকাল, কয়জন শিক্ষিত হিন্দু ম্লেচ্ছ-স্পর্শে পাপ মনে করেন? আজকাল শিক্ষিত হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ শূদ্রের আকাশ পাতাল প্রভেদ কি ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে না? নব্য সম্প্রদায়ের কয়জন; নিকৃষ্ট বর্ণীয় পাচক প্রস্তুত খাদ্য (বা হিন্দু ধর্ম্মের নিষিদ্ধ খাদ্য) উদরস্থ করা পাপ মনে করেন?

৪। বিধবা-বিবাহ নিষেধ। বিধবাবিবাহ যে হিন্দু ধর্ম্মে নিষিদ্ধ নহে, তাহা মান্যবর পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। তবে কেন হিন্দু সমাজ বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত? অনেক পতিব্রতা সাধ্বী বিধবার মনে দ্বিতীয়বার বিবাহের ভাব হয়ত কখনও উদিত হইবে না, তাঁহারা পতিব্রতার আদর্শ; হিন্দু গৃহ উজ্জ্বল করিতে থাকুন। কিন্তু তাই বলিয়া যে হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ থাকিবে, তাহা কোন ক্রমেই যুক্তিসঙ্গত নহে।

৫। বাল্য-বিবাহ। ইহা যে, মোটের উপর, কুফল-প্রদ তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অনেকেই এ বিষয়ে ভুক্তভোগী—অতএব অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই।

যেরূপ প্রাচীরস্থ তরুলতা প্রাচীন অট্টালিকার অংশ হইলেও, উহার পক্ষে হানিজনক, সেইরূপ উপরোক্ত সামাজিক নিয়ম সমূহ এখন হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত হইলেও উহার শত্রু। ঐ সকল নিয়মের উচ্ছেদে, হিন্দুধর্ম্মের লাভ ব্যতীত ক্ষতি নাই। ফলতঃ হিন্দুধর্ম্মের স্থায়িত্বের জন্য উহাদের বিনাশ অত্যাবশ্যক।

সমাজবদ্ধ হইলেই মনুষ্যকে আত্মত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, অনেক বিষয়ে সমাজের অধীন হইতে হয়। ইহা জানা কথা। অনেকে ইহার বিকৃত অর্থ করিয়া, সমাজে যে কোন নিয়ম প্রচলিত থাকে, ভালই হউক, আর মন্দই হউক, তাহার চির স্থায়িত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহাদের মত, আমরা যে সকল নিয়মের উল্লেখ করিলাম, বিচার-সঙ্গত হউক আর না হউক, উন্নতি-বিরুদ্ধ হউক আর না হউক, হিন্দু সমাজের সভ্যদিগের পক্ষে ইহা প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। কারণ, ঐ সকল নিয়ম অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে; না মানিলে সমাজের সুশৃঙ্খলা রক্ষা হয় না। যাঁহারা এরূপ মত প্রকাশ করেন, এবং বাস্তবিক তদনুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু আর একটু উন্মীলিত হওয়া আবশ্যক। বস্তুতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই উল্লিখিত নিয়ম সমূহের উপর আন্তরিক আস্থা আদৌ নাই। অন্ততঃ কখন কখন, তাঁহাদিগের উহার কোন কোনটির প্রতিকূলাচারী হইতে দেখা যায়। সে যাহা হউক, উল্লিখিত নিয়মসমূহ প্রতিপালনে বিরত হইলে, সমাজে কি বিশৃঙ্খলতা, কি ঘোর বিপদ ঘটিবে, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে অসমর্থ। মনে কর, কোন ব্রাহ্মণ তাঁহার শ্রদ্ধাস্পদ, হৃদয়ের বন্ধু, কোন শূদ্রের সহিত এক সঙ্গে আহার করিলেন, তাহাতে সমাজের কি হানি হইল? মনে কর, কোন পিতা তাহার অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যার দ্বিতীয় বার বিবাহ দিলেন—তাহাতে সমাজের ক্ষতি কি? মনে কর, কোন ব্যক্তি বাণিজ্য বা জ্ঞানলাভের উদ্দেশে ইউরোপ যাইলেন,

নিষিদ্ধ খাদ্য খাইলেন, বর্ণভেদের বন্ধন ছিঁড়িলেন, তাহাতে তাঁহার নিজের, সমাজের এবং দেশের উপকারের, না অপকারের, সম্ভাবনা? স্বীকার করি, যে ভিন্ন বর্ণে বিবাহ হইলে—তাহার এখনও অনেক বিলম্ব—আইন লইয়া একটু গোল হইতে পারে। কিন্তু, আইন সমাজের জন্য, না সমাজ আইনের জন্য? সমাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আইনেরও পরিবর্ত্তন হইবে।

হিতকারি, উন্নতিশীল পরিবর্ত্তনে যদি বিশৃঙ্খলতা হয়, তাহা হইলে সেরূপ বিশৃঙ্খলতা নিশ্চয়ই বাঞ্ছনীয়। সেরূপ বিশৃঙ্খলতা ব্যতীত ব্যক্তিগত বা সমাজগত উন্নতি সাধিত হয় না। আধুনিক বিজ্ঞান পড়িয়া অনেক খ্রীষ্টানের মনে বিশৃঙ্খলতা জন্মে; বাল্যকালে যে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল, তাহাতে বিষম আঘাত লাগে, মন বিচলিত হয়—তবে কি সে বিজ্ঞানপাঠ বন্ধ করিবে? পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রযুক্ত আমাদের মনে বিশৃঙ্খলতা জন্মে, সমাজের যে সকল প্রথা যুক্তি-বিরুদ্ধ এবং হানিজনক বলিয়া প্রতীতি হয়, তদনুসারে কার্য্য করিতে প্রবৃত্তি থাকে না—তবে কি আমাদের স্কুল কলেজ বন্ধ করিতে হইবে? তাহা হইলেত সমাজের শৃঙ্খলতা-রক্ষাকারিদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়!

বলা বাহুল্য, যে, যে পরিবর্ত্তনে উন্নতি সম্ভব, কেবল তাহাই অবলম্বনীয়। সমাজের যে সকল প্রথা স্পষ্টরূপে ধর্ম্মবিরোধী, নীতিবিরোধী, বা হানিজনক নহে, সেগুলি যেন আমরা রক্ষা করি। পাশ্চাত্য শিক্ষার সুফলের সঙ্গে সঙ্গে কুফলও ফলিতেছে। সুফলের গাছগুলিরই আমরা যত্ন করিব।

কতকগুলি বৃক্ষে ফল ধরিয়াছে; তন্মধ্যে যে যে বৃক্ষের ফল মিষ্ট, কেবল তাহাই রক্ষণীয়।

ভারতবর্ষের নবজীবনের সঙ্গে সঙ্গে, হিন্দুধর্ম্মের নবজীবনের সূত্রপাত হইয়াছে। ভাল চিহ্ন, আনন্দের বিষয়। কিন্তু যেন আমাদের স্মরণ থাকে, যে নবীন উৎসাহ, নূতন প্রেম, নবানুরাগ সচরাচর প্রবল হইলেও সকল সময়ে স্থায়ী হয় না। হিন্দুধর্ম্মের উপর নব্যবঙ্গের যে অনুরাগ, যে উৎসাহ দেখা যাইতেছে, তাহার স্থায়িত্ব যদি আমাদের বাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে, আমাদের ধর্ম্মকে সমাজ হইতে কতকটা বিচ্ছিন্ন করা অত্যাবশ্যক। হিন্দুধর্ম্মের সহিত হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান সম্বন্ধ অধিক দিন থাকিবে না।—থাকিতে পারে না। হিন্দুধর্ম্ম যতই কেন উদার হউক না, বিশ্বাস সম্বন্ধে যতই কেন প্রশস্ত হউক না, আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত হিন্দুধর্ম্মের যতই কেন সামঞ্জস্য থাকুক না, যতদিন ইহা অবনতিগ্রস্ত, অদূরদর্শী, সঙ্কীর্ণমনা, সমাজের দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিবে, ততদিন ইহা নবজীবন পাইবে না।

উপায় কি?

ভারতবাসী অতিশয় দরিদ্র। কৃষকেরা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। অনাবৃষ্টির ত কথাই নাই; এক বৎসর ভাল বৃষ্টি না হইলে, চারিদিকে হাহাকার রব শুনিতে পাওয়া যায়। শিল্পকরিদের ব্যবসা চলে না; তাহারা ক্ষুৎপীড়িত কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। শিক্ষিত যুবকেরা চাকরির

জন্য লালায়িত। ত্রিশ, চল্লিশ টাকা বেতনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটেরা উমেদার। যেখানে যাও, দুঃখ কষ্ট দারিদ্র্যের দৃশ্য দেখিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইবে।

দেশে দারিদ্র্য দিন দিন বাড়িতেছে বই কমিতেছে না, অনেকের এরূপ বিশ্বাস। ইহা অমূলক নহে। প্রতি বৎসর দেশ হইতে ন্যূনাধিক বিশ কোটি টাকা বিলাতে যাইতেছে। এই প্রকারে কত টাকা চলিয়া গিয়াছে! এক দিকে এইরূপ শোষণ চলিতেছে, অন্যদিকে দেশের ধনবৃদ্ধির বিশেষ লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় না। বড় বড় কয়েক জন ব্যবসায়ী, জমিদার, উকীল ও মোটামাহিনার চাকুরে ব্যতীত, সকলেই নির্ধন। ইঁহারা দেশের অনেক উপকার করিতে পারেন, কেহ কেহ করিয়াও থাকেন। ইঁহারা দেশের ধনবৃদ্ধিতেও কিছু সাহায্য করিয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহাদের দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধি হয় না, অথবা যদি হয় ত অতি অল্প পরিমাণে। ইঁহারা ধনী, গরিব কৃষক ও শিল্পকারের ধনে। দেশের ধনবৃদ্ধি সম্বন্ধে ইঁহাদিগকে "নিষ্কর্ম্মা" বলা যাইতে পারে। এই সকল "নিষ্কর্ম্মা" লোকের সংখ্যাই দিন দিন বাড়িতেছে। ইঁহাদের মধ্যে অতি অল্প সংখ্যক লোকেরই অবস্থা ভাল, অধিকাংশেরই অবস্থা মন্দ, কোন রূপ প্রকারে সংসার চলে। কৃষকদিগের অবস্থা মন্দ, শিল্পকারীদের অবস্থা মন্দ, যাহারা কৃষক ও শিল্পকারীদের উপার্জ্জিত ধনে জীবনধারণ করে, তাহাদের অধিকাংশেরই অবস্থা মন্দ। জীবন-সংগ্রাম দিন দিন ভীষণতর হইতেছে, আরও হইবে। এক্ষণে উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কিন্তু উপায় কি?

যে শোষণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তাহার যে অংশের জন্য গবর্ণমেণ্ট দায়ী, তাহার হ্রাসের জন্য বিলাতে ও এদেশে আন্দোলন চলিতেছে; গবর্ণমেণ্টও কতকটা চেষ্টা করিতে-ছেন। অধিক সংখ্যক ভারতবাসী দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কাজ চালাইলে, এবং অন্যান্য উপায়ে তাহার হ্রাস হইতে পারে, এবং কালে হইবেও; কিন্তু অধিক পরিমাণে, সম্ভব নহে। ব্রিটিস রাজ্যে আমরা যে শান্তি এবং অন্যান্য সুফল লাভ করিয়াছি, তাহার মূল্য হিসাবে ধর, অথবা ব্রিটিস রাজ্যের কর হিসাবে ধর, ব্রিটিস সেনা এবং অন্যান্য ব্রিটিস কর্ম্মচারীদের পেন্সনাদির জন্য প্রতিবৎসর ভারতবর্ষ হইতে বিলাতে টাকা পাঠাইতে হইবে। ইহা অনিবার্য্য। যে পরিমাণে টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, সেই পরিমাণে দেশের মূলধন কমি-তেছে, এবং দেশ গরিব হইতেছে। আরও যাহাতে গরিব না হইয়া যায় তাহার জন্য চেষ্টা কর্ত্তব্য, না করিলে আমা-দের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে। কিন্তু উপায় কি?

এই প্রশ্নের সংক্ষেপ এবং সহজ উত্তর—দেশের ধনবৃদ্ধি। ইহা কি কি উপায়ে সম্ভব দেখা যাউক।

প্রথমতঃ। শিল্পকর্ম্ম। কৃষিজ, অরণ্যজ, বা খনিজ পদার্থ হইতে অন্যান্য দ্রব্য প্রস্তুত করাকে শিল্পকর্ম্ম বলা যায়। তুলা হইতে কাপড়, ইণ্ডিয়ারবার হইতে ওয়াটারপ্রুফ, লৌহ-ঘটিত আকরিক পদার্থ হইতে লৌহ, এবং লৌহ হইতে ছুরি কাঁচি, ইত্যাদি প্রস্তুত করা শিল্পকর্ম্ম। শিল্পই দেশের ধনবৃদ্ধির প্রধান উপায়। ইংলণ্ড প্রভৃতি যে সকল দেশ ধনী তাহা প্রধানতঃ শিল্পের জন্য। ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল হইতে

নানাবিধ শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ব্রিটিস রাজ্যের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত, আমরা নানাবিধ শিল্প বিদেশে রপ্তানি করিতাম। কিন্তু এক্ষণে সে সব শিল্প লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এক্ষণে, আমাদের শিল্প বিদেশে পাঠান দূরে থাকুক, তাহার পরিবর্ত্তে বিদেশীয় শিল্প আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। আমরা পরি বিলাতী ধুতি, বিলাতী জামা, মাথায় দি বিলাতী ছাতা। আপীসে যাই বা সভায় বক্তৃতা করি বিলাতী প্যাণ্টলুন, বিলাতী কোট, বিলাতী মোজা এবং বিলাতী জুতা করিয়া। আমাদের সচরাচর ব্যবহার্য্য অধিকাংশ জিনিসই বিলাতী, আমাদের মধ্যে যাঁহারা "সভ্য" তাঁহারা আহার করেন বিলাতী বাসনে, বিলাতী ছুরি কাঁটা ও চামচে, পান করেন বিলাতী গেলাসে। আমাদের থালা, ঘটি, বাটি ইত্যাদি বিদেশী ধাতু নির্ম্মিত, কিন্তু এখানে প্রস্তুত হয়; তাহাও বোধ হয় কিছু দিন পরে বিলাত হইতে আমদানি হইবে। আর কত নাম করিব? বিলাতী শিল্পের আমদানি দিন দিন বাড়িতেছে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্প মারা যাইতেছে; ইহা চোখ খুলিয়া দেখিলে চারিদিকে দেখিতে পাওয়া যায়। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া যাহা আমরা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করি, তাহা আরও হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করিব। ভারতবর্ষে বহুদিন হইতে লৌহ-ঘটিত আকরিক পদার্থ হইতে লৌহ এবং তন্নির্ম্মিত নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইত। দিল্লীতে "কুতব" নামে যে লৌহ স্তম্ভ আছে, তদ্রূপ স্তম্ভ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপীয় কোন কারখানায় নির্ম্মিত হইতে পারিত না। এখনও ইউরোপে অতি অল্প কারখানা আছে, যেখানে এরূপ প্রকাণ্ড স্তম্ভ প্রস্তুত হইতে পারে।

যদিও "কুতব" নামে অভিহিত, ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে, যে এই স্তম্ভ প্রায় ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই ১৫০০ বৎসর ইহা খাড়া রহিয়াছে, কত ঝড়, বৃষ্টি, বাদ্‌লা ইহার উপর দিয়া গিয়াছে, তথাপি ইহাতে মরিচা ধরে নাই। আরও অন্যান্য স্থানে অনেক বড় বড় প্রাচীন লৌহ-নির্ম্মিত কামান ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয় "ইস্পাৎ" পূর্ব্বে অতি আদরণীয় ছিল; ইংলণ্ড এবং অন্যান্য স্থানে যাইত। জগদ্বিখ্যাত ডামাস্কস তরবারি ভারতীয় ইস্পাতে নির্ম্মিত হইত। এক্ষণে প্রতি বৎসর বিলাতী লোহা ও ইস্পাতের আমদানি বাড়িতেছে; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশী লোহা ও ইস্পাৎ লোপ পাইতেছে। লৌহ-নির্ম্মিত যন্ত্রাদি এবং ছুরি কাঁচি ইত্যাদি দ্রব্য ছাড়া, ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা প্রতি বৎসর প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার লৌহ এবং ৫ লক্ষ টাকার ইস্পাৎ বিলাত হইতে আমদানি করিতাম। কিন্তু ১৮৮৫ সালে আমরা অন্যূন ২ কোটি টাকার লোহা এবং ১৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ইস্পাৎ আমদানি করি। অতএব ৩০ বৎসরের মধ্যে লোহা এবং ইস্পাতের আমদানি প্রায় ৪ গুণ বাড়িয়াছে।* দেশী লোহা এবং ইস্পাৎ এক্ষণে দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশ ভিন্ন প্রায় আর কোথাও দেখা যায় না। অথচ আমাদের দেশে লৌহ-

* লৌহ-নির্ম্মিত যন্ত্র এবং ছুরি কাঁচি ইত্যাদি দ্রব্য ছাড়া, এবং গবর্ণমেণ্ট বিলাত হইতে যে লোহা আনিয়াছেন তাহা ছাড়া, ১৮৬৮ হইতে ১৮৮৫ সাল পর্য্যন্ত ১৮ বৎসরে আমরা ২৪, ৬০, ৮৭, ৫৪৩ (প্রায় চব্বিশ কোটি একষট্টি লক্ষ টাকার) লোহা আমদানি করিয়াছি।

শিল্পের অনুকরণ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যেরূপ লোহার আমদানি বাড়িয়াছে, সেইরূপ কার্পাসবস্ত্রেরও আমদানি বাড়িয়াছে। অথচ আমাদের দেশে কার্পাস অপর্য্যাপ্ত, এখান হইতে কার্পাস ম্যাঞ্চেষ্টারে যায়, এবং সেখানে বস্ত্রে পরিণত হইয়া ফিরিয়া আসে। লোহা এবং কাপড়ের ন্যায় অন্যান্য অনেক জিনিসের আমদানি বাড়িয়াছে, যাহা এখানে প্রস্তুত হইতে পারে; যাহা প্রস্তুত করিলে দেশের ধনবৃদ্ধি হইতে পারে।

এরূপ অবস্থা হইবার কারণ কি? গবর্ণমেণ্ট আমাদিগকে দেশীয় শিল্প ত্যাগ করিতে, এবং বিদেশীয় শিল্প ব্যবহার করিতে হুকুম দেন নাই। বরঞ্চ আমাদের শিল্পোন্নতি চাহেন বলিয়া থাকেন। আমাদের শিল্পোন্নতিতে দেশের ধনবৃদ্ধি হইবে; এবং দেশের ধনবৃদ্ধি হইলে গবর্ণমেণ্টের লাভ। সত্য বটে ইউনাইটেডষ্টেট্‌স্, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ বিদেশীয় শিল্পের উপর শুল্ক লইয়া, তাহার আমদানি কমাইয়া থাকেন। আমাদের গবর্ণমেণ্ট তাহা করেন না, এবং কখনও করিবেন না। কিন্তু করিলেও বিলাতী শিল্পের বিরুদ্ধে আমাদের প্রাচীন দেশীয় শিল্প সংগ্রাম করিতে সক্ষম হইত না। তাহার কারণ স্পষ্ট। আমাদের প্রাচীন শিল্প বিনাশ পাইয়াছে, স্বাভাবিক কারণে। লোকে চায় শস্তা জিনিস। আমাদের প্রাচীন শিল্পকারদের বিশেষ শিল্পনৈপুণ্য ছিল, কিন্তু তাহা হাতের। আমাদের শিল্প সম্পাদিত হইত হাতে, অথবা এরূপ কলে, যাহাকে বিলাতী কলের কাছে খেলনা-কল বলা যাইতে পারে। হাতে জিনিস প্রস্তুত করিতে পরিশ্রম অনেক, কাযেই

তাহার দাম বেশী। কিন্তু বিলাতী শিল্প সম্পাদিত হয়, কলে। কলে যে কত কায কত অল্প সময়ে সম্পন্ন হয় তাহা প্রত্যক্ষ না করিলে সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হয় না। সুতরাং কলের জিনিস শস্তা। বিলাতী এবং দেশী ধুতির দাম তুলনা করিলে তাহার কত প্রভেদ, কে না জানেন? অথচ কলের সূতা হইতেই দেশী ধুতি তৈয়ার হয়! এক্ষণে হস্তনৈপুণ্যের দিন অতীত হইয়াছে; আজ কাল কল কৌশলের রাজ্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, ততই কলকৌশলের বৃদ্ধি হইতেছে, ততই অল্প পরিশ্রমে সচরাচরব্যবহার্য্য জিনিস প্রস্তুত হইতেছে, এবং ততই তাহার দাম কমিতেছে। এরূপ অবস্থায় হস্ত-নির্ম্মিত জিনিসের মরণ নিশ্চয়। আমাদের প্রাচীন শিল্পের পুনর্জীবন, প্রাচীন উপায়ে অসম্ভব; নবজীবন সম্ভব, আধুনিক উপায়ে। আধুনিক বিজ্ঞানোদ্ভাবিত উপায় অবলম্বন ব্যতীত আমাদের গতি নাই। ইহার জন্য দুইটি বিষয়ের বিশেষ প্রয়োজন।

১ম। বিজ্ঞান শিক্ষার, বিশেষতঃ যেরূপ শিক্ষা শিল্পে প্রয়োজনীয়, তাহার বিস্তার। আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পের মূলভিত্তি বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের উন্নতিই পাশ্চাত্য শিল্পের উন্নতির মূল কারণ। এদেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা নাই বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। সাধারণের ইহাতে আস্থা নাই; বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চেষ্ট। আমরা যে শিক্ষা চাই, তাহাতে কেরানিগিরি বা ওকালতী ভিন্ন জীবন ধারণের প্রায় অন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে সক্ষম হই না। কলম ও বাক্য ব্যতীত শিক্ষিত বাঙ্গালীর জীবন-সংগ্রামের অন্য কোন অস্ত্র

নাই বলা যাইতে পারে। কিন্তু ২০। ২৫ বৎসরের মধ্যে দেশের এমন অবস্থা হইবে, যখন অন্যান্য অস্ত্র ব্যতীত চলিবে না। এখনি তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। যেরূপ বিজ্ঞান শিক্ষায় শিল্পের উন্নতি সম্ভব, ইংলণ্ডে তাহার বিশেষ বিস্তার হইয়াছে। তথাপি ইংরাজেরা সন্তুষ্ট নহেন; যাহাতে ঐরূপ শিক্ষার আরও বিস্তার হয়, তজ্জন্য ইংলণ্ডে হুলস্থূল পড়িয়াছে, সভা স্থাপিত হইয়াছে, পার্লিয়ামেণ্ট বিলপাশ করিতেছেন। আমাদের শিল্প লোপ পাইয়াছে, দেশ গরিব হইতেছে, দেশের অর্দ্ধেক লোক পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, তথাপি আমরা কি চেষ্টা করিতেছি?

২য়। সমবেত চেষ্টা। দিন কত "টেকনিকাল এডুকেশন" লইয়া সভায় বক্তৃতা ও খবরের কাগজে লেখা হইল। কিন্তু সমবেত এবং ক্রমিক চেষ্টা ও অধ্যবসায় কোথায়? শিল্পোন্নতির জন্য সমবেত চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন। আধুনিক প্রথানুসারে শিল্প চালাইতে হইলে, অনেক মূলধনের আবশ্যক। তাহা সচরাচর একজনে কুলাইয়া উঠিতে পারেন না। অতএব, বড় বড় কল কারখানা প্রায়ই কোম্পানি দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষীয়দের মধ্যে বোম্বাই অঞ্চলের লোকেরা এইরূপে একত্র হইয়া কতগুলি সূতার ও কাপড়ের কল চালাইতেছেন। কিন্তু বাঙ্গালীরা এ বিষয়ে অগ্রসর হন না, তাঁহারা একত্র হইয়া কাজ করিতে জানেন না। একাকী যিনি যাহা করিতে পারিলেন করিলেন; একত্র হইয়া কায করিতে চান না। দলাদলি সর্ব্বত্র আছে; কিন্তু এখানে দলাদলির যেরূপ প্রাদুর্ভাব, সেরূপ বোধ হয় আর কোথাও

নাই। ইতিপূর্ব্বে আমরা একত্র হইয়া কায করি নাই; সে শিক্ষা আমরা পাই নাই। বর্ত্তমান দুরবস্থার তাহাই একটি প্রধান কারণ। কারণ যাহাই হউক, যতদিন আমরা একত্র হইয়া কায করিতে না শিখিতেছি, ততদিন আমাদের দ্বারা দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে না।

সূতার কল, কাপড়ের কল, কাগজের কল, আর যাহারই বল, এক্ষণে ভারতবর্ষে যে সকল কল চলিতেছে, তাহা বাঙ্গালী ব্যতীত অন্যান্য ভারতবর্ষীয় বা ইউরোপীয়দিগের। আমরা ইহা দেখিয়াও দেখি না। সত্য বটে, আমাদের শিল্পোন্নতির পথ সহজ নহে। অন্যান্য গবর্ণমেণ্টের ন্যায় আমাদের গবর্ণমেণ্ট বিদেশীয় শিল্পের উপর শুল্ক লইবেন না। ইহা দেশীয় তরুণ শিল্পের পক্ষে অতিশয় হানিজনক। কিন্তু, গবর্ণমেণ্ট দেশীয় শিল্প কিনিতে প্রতিশ্রুত। যে দ্রব্য এখানে পাওয়া যায়, এবং যাহার মূল্য সেইরূপ বিলাতি দ্রব্য হইতে অধিক নহে, গবর্ণমেণ্ট তাহা এখানে কিনিবেন। আমরাও যদি যথাসাধ্য দেশীয় শিল্প ব্যবহার করি, তাহা হইলে অনেকটা উপকার সম্ভব। ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে দেশীয় শিল্প ব্যবহার করিবার জন্য সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা (বাঙ্গালীরা) অন্যান্য ভারতবাসী অপেক্ষা সভ্য, আমরা বিলাতি জিনিষ পাইলে দেশী জিনিষ চাই না! আমরা একটিও সূতার কল, একটিও কাপড়ের কল, একটিও কাগজের কল, একটিও কোন রূপ শিল্পের কল চালাইতেছি না!

দেশের দারিদ্র্য শিল্পোন্নতির এক প্রতিবন্ধক। যেখানে টাকার সুদ শতকরা ১২ কি ১৫ কি ততোধিক, সেখানে যাঁহা-

দের মূলধন আছে, তাঁহারা যে তাহা কেবল সুদে খাটাইবেন তাহা বিশেষ আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু বঙ্গদেশের দারিদ্র্য যে বোম্বাই প্রদেশের অপেক্ষা অধিক তাহা বোধ হয় না। ভাল করিয়া চালাইলে শিল্প হইতেও বিশেষ লাভের সম্ভাবনা। শিল্পোন্নতি না হইলে দেশের দারিদ্র্য বাড়িবে; যে সকল ধনবান্ কি মধ্যবিত্ত লোক দেশের হিত কামনা করেন, তাঁহাদের ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক। যাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দেন, তাঁহারা যদি সকলে একত্র হইয়া উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত চেষ্টা করেন, তাহা হইলে দেশীয় শিল্পের অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারেন। আমরা চেষ্টা করিলে, কেবল যে আমাদের প্রয়োজনীয় কাপড়, লোহা, কাগজ প্রভৃতি জিনিস প্রস্তুত করিতে পারি এমত নহে, তাহার কোন কোন জিনিস বিদেশেও রপ্তানি করিতে পারি।

দ্বিতীয়তঃ। খনিজ পদার্থ দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা। শিল্পের ন্যায় প্রাচীন ভারতবর্ষে হীরক এবং স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র প্রভৃতি ধাতু ঘটিত আকরিক পদার্থের খনি ছিল, তাহার নিদর্শন অনেক স্থানে পাওয়া যায়। কিন্তু শিল্পের ন্যায় আমাদের খনিকার্য্যও প্রায় লোপ পাইয়াছে। যেরূপ শিল্পে, সেইরূপ ইহাতেও, আমরা একেবারে নিশ্চেষ্ট। এক্ষণে খনির কার্য্য ইউরোপীয়দিগের প্রায় একচেটিয়া বলা যাইতে পারে। আমরা যে খরচে ঐ সকল কাজ করিতে সক্ষম হইতে পারি, তাহা অপেক্ষা নানা কারণে তাঁহাদের অনেক খরচ করিতে হয়। তথাপি তাঁহারা খনির কাজ করিতেছেন, এবং অনেক স্থলে লাভের সহিত। যে যে উপায়ে শিল্পের, সেই

সেই উপায়ে খনিকার্য্যেরও উন্নতি সম্ভব—শিক্ষা এবং সমবেত চেষ্টা। কেহ কেহ বলিতে পারেন, পূর্ব্বে যাহারা খনির কায করিত, তাহারা কোন শিক্ষা পাইত না, কিন্তু এক্ষণে তাহা সম্ভবে না কেন? তাহার কারণ, প্রথমতঃ, ভারতবর্ষ অতি প্রাচীন-কালেই সভ্যতা লাভ করিয়াছিল। লৌহঘটিত আকরিক পদার্থ ব্যতীত যে যে খনিজ পদার্থ জমির উপর বা অল্প নীচে ছিল তাহার প্রায় সব উত্তোলিত হইয়াছে। এক্ষণে সেই সকল পদার্থের জন্য জমির অনেক নীচে অনুসন্ধান করিতে হয়; তজ্জন্য শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বে যে সকল উপায়ে ধাতুঘটিত আকরিক পদার্থ হইতে ধাতু প্রস্তুত করা হইত, বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এক্ষণে তাহার অনেক উন্নতি হইয়াছে। এই সকল নূতন এবং উন্নত উপায় অবলম্বন ব্যতীত, খনিজ পদার্থোত্তলনে লাভের সম্ভাবনা নাই; এবং তাহার জন্য শিক্ষা এবং মূলধন আবশ্যক। তৃতীয়তঃ, পাথুরিয়া কয়লা পেট্রোলিয়ম প্রভৃতি খনিজ পদার্থ ভারতবর্ষের পক্ষে নূতন; পূর্ব্বে উহা খনিত হইত না। উহা দ্বারা দেশের ধনবৃদ্ধির সম্ভাবনা; কিন্তু শিক্ষা এবং যথেষ্ট মূলধন ব্যতীত লাভের সহিত উহার উত্তোলন সম্ভব।

আমরা "উচ্চশিক্ষা" পাইয়াছি, উচ্চশিক্ষার গৌরব করি, কিন্তু যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, পেট্রোলিয়ম বা লৌহ-তাম্রাদি ধাতুঘটিত আকরিক পদার্থ, বা পাথুরিয়া কয়লা কি? ভারতবর্ষের কোথায় কোথায় পাওয়া যায়? কিরূপ স্থানে অনুসন্ধান করিলে পাওয়া সম্ভব? কিরূপে উহা খনিত হইতে পারে? কোন্ পুস্তকে ঐ সকল বিষয়ের তত্ত্ব পাওয়া যায়? তঁত্ত্ব

পাইলেও তাহা বুঝিতে পারি কি না? এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই নির্ব্বাক হইবেন। ইউরোপীয়েরা ভারতবর্ষের কোন্ নিভৃত জঙ্গলে কোন্ খনিজ পদার্থ আছে, কোন্ স্থানে কোন্ খনিজ পদার্থ উত্তোলন করিলে লাভের সম্ভাবনা, তাহার খবর রাখেন; ঐরূপ খবর রাখিতে যে শিক্ষার প্রয়োজন তাঁহারা তাহা পাইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট খনিজ পদার্থ সম্বন্ধে খবর ছাপাইয়া থাকেন। খবরাখবর লওয়া এবং ছাপানর খরচ আমরা দিয়া থাকি; অথচ আমরা তাহার কিছুই জানি না। কোথায় খবর পাওয়া যায় তাহাও জানি না; পাইলেও বুঝি না, বুঝিতে চেষ্টাও করি না। অথচ ইংলণ্ডে কোন্ সালে কে রাজা হইয়াছিল, কোন্ যুদ্ধ কোন্ সালে হয়, কে হারে কে জিতে, ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর উত্তর কণ্ঠস্থ। সেক্সপিয়ার, মিলটন, যে সকল কথা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার টীকা টিপ্পনি অভ্যস্থ।

তৃতীয়তঃ। কৃষিকর্ম্ম। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধানদেশ; এবং ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি প্রাচীন। যে সকল জমি উর্ব্বরা, বহুকাল হইতে তাহা কর্ষিত হইতেছে। যে সকল সহজপ্রাপ্য সারে জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়িতে পারে, আমাদের কৃষকেরা বহুকাল হইতে তাহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। অল্প ব্যয়ে, যে সকল সহজ উপায়ে কৃষির উন্নতি সম্ভব, বহুদিন তাহা অবলম্বিত হইয়াছে। পাট প্রভৃতি চাসের বিস্তারে, কোন কোন স্থানে চাসের উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু সে উন্নতি সামান্য। গবর্ণমেণ্ট স্থানে স্থানে মডেল ফার্ম স্থাপন করিয়াছেন। ইহা দ্বারা এবং কৃষি শিক্ষার

বিস্তার দ্বারা কতকটা উন্নতি সম্ভব। কিন্তু অদ্যাপি বিশেষ যে কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহার লক্ষণ দেখা যায় না। আজ কয়েক বৎসর হইতে গমের রপ্তানি বাড়িতেছে। তাহা দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে, গমের চাসের বৃদ্ধি বা উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু তাহা সন্দেহ-স্থল। ইউরোপে আমাদের গম অন্যান্য দেশের গম অপেক্ষা সস্তা মূল্যে বিক্রীত হয়, এবং পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে সকল স্থান দুর্গম ছিল, সেখানে রেলওয়ের বিস্তার হইতেছে, গমের রপ্তানিবৃদ্ধির এই দুইটি প্রধান কারণ, ইহাই আমাদের ধারণা। ছত্রিশগড়ে রেলওয়ে যাওয়াতে সেখানকার অনেক গম এক্ষণে রপ্তানি হয়; কিন্তু ছত্রিশগড়ের চাসের বিশেষ কোন উন্নতি বা বৃদ্ধি লক্ষিত হয় না। পূর্ব্বে সেখানে যে গম সঞ্চিত থাকিত, এক্ষণে তাহা বিদেশে চলিয়া যায়। পূর্ব্বাপেক্ষা দাম অনেক চড়িয়াছে, কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ইহাতেও ছত্রিশগড়ের বিশেষ লাভ কি না তাহা সন্দেহ। অনাবৃষ্টি কি দুর্ভিক্ষের সময় তাহা বুঝা যাইবে।

যে সকল চাসে বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা—যথা চা এবং তামাকের চাস—তাহাতে কিছু শিক্ষা এবং মূলধনের প্রয়োজন। তাহা আমাদের সাধারণ কৃষকের এক প্রকার সাধ্যাতীত বলা যাইতে পারে। এক্ষণে বড় বড় খনিকার্য্যের ন্যায় এই সকল চাস ইউরোপীয়দিগের এক প্রকার একচেটিয়া। কোথায় আসামের অস্বাস্থ্যকর জলা জঙ্গলময় পার্ব্বত্য প্রদেশ, তাঁহারা "সাত সমুদ্র তের নদী" পার হইয়া আসিয়া, অনেক টাকা ব্যয় করিয়া সেখানে গিয়া চাস করিতেছেন। আমরা এ

সকল কার্য্যে বড় একটা অগ্রসর হই না। ফল এই দাঁড়াইতে-তেছে—ইউরোপীয়চালিত শিল্প এবং খনিকার্য্যের ন্যায় এ সকল কৃষিকর্ম্মের লাভ বিলাত চলিয়া যাইতেছে—যে লাভ এখানে থাকিলে দেশের ধনবৃদ্ধি হইত।

আমাদের দারিদ্র্যের জন্য কেবল যে গবর্ণমেণ্ট দায়ী তাহা নহে। গবর্ণমেণ্টের উপর সমুদয় দোষ চাপাইয়া কেবল গবর্ণমেণ্ট দ্বারা যতটুকু দারিদ্র্যমোচন হইতে পারে, তাহার জন্য কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে আমাদের দারিদ্র্য ঘুচিবে না। এই দারিদ্র্যের জন্য আমরা নিজেরাও অনেকটা দায়ী, সম্ভবত গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা অধিক পরিমাণে। আমরা নিজেরা যে যে উপায়ে আমাদের এবং দেশের অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে পারি তাহা অবলম্বন করিতে চেষ্টাবান্ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কেবল কলম এবং বাক্য পরিচালনায়, কখনও কোনও দেশের উন্নতি হয় নাই, কখনও কোনও দেশের উন্নতি হইবে না।

ভারতে বিলাতী সভ্যতা।

ভারতবর্ষের দারিদ্র্য সর্ব্ববাদিসম্মত; এই দারিদ্র্য যে দিন দিন বাড়িতেছে, তাহাও অনেকের ধারণা। ভারতবর্ষ হইতে প্রতি বৎসর বিশ কোটি বা ততোধিক টাকা বিলাতে চলিয়া যায়, যাহার বিনিময়ে আমরা কোন জিনিস পাই না—এই বাৎসরিক শোষণ আমাদের দারিদ্র্য বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ বলিয়া কেহ কেহ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

কিন্তু, অনেকে বলেন, সে যাহাই হউক, এই যে আমরা বিশ কোটি টাকা বিলাতে পাঠাই, তাহার বিনিময়ে যে আমরা কিছুই পাই না, সে কথা ঠিক নহে; তাহার বিনিময়ে আমরা বিলাতী সভ্যতা পাইয়াছি!

ইহা সত্য। তবে উদর ভরিয়া খাইতে না পাইয়া, এত টাকা দিয়া, আমরা যে জিনিসটি কিনিতেছি, তাহা একবার "যাচাই" করা আবশ্যক। জিনিসটি কত পরিমাণে খাঁটি, কত পরিমাণে বা তাহাতে "খাদ" আছে, ভাল করিয়া পরীক্ষা করা উচিত।

১। প্রথমতঃ, ব্রিটিস রাজ্যে যুদ্ধবিপ্লব প্রায় বন্ধ হইয়াছে, শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। ভারতবাসী এবং ব্রিটন, সকলেই একবাক্যে ইহা বলিয়া থাকেন। ইহার সত্যতাবিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু, শান্তি সভ্যতা বিস্তারে সহায়তা করে মাত্র। যুদ্ধ-বিগ্রহ সত্ত্বেও অনেক দেশকে সভ্য হইতে দেখা গিয়াছে। নেপোলিয়ানের সময় হইতে ফ্র্যাঙ্কোজরমান যুদ্ধ পর্য্যন্ত ফ্র্যান্স দেশ কত বিপ্লবে আলোড়িত হইল। তথাপি ঐ কালে ফরাসিরা সভ্যতার পথে বিশেষরূপে অগ্রসর হইয়াছিল।

শান্তি যে সকল অবস্থাতেই উন্নতিব্যঞ্জক তাহা নহে। ভারতবর্ষে শান্তি আছে বলিয়াই যে উহার উন্নতি হইতেছে, এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত নহে।

এক্ষণে ভারতে বিলাতী সভ্যতা বিস্তারের যে সকল চিহ্ন সচরাচর প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহাতে বাস্তবিক আমাদের কতদূর প্রকৃত উন্নতি প্রকাশ করে দেখা যাউক।

২। রেলরোড, টেলিগ্রাফ ইত্যাদি। রেল রোড এবং টেলিগ্রাফের বিস্তার ভারতের বিলাতী সভ্যতার বিশেষ পরিচায়ক, এবং ব্রিটিশরাজ্যের বিশেষ গৌরব বলিয়া বিঘোষিত হয়। উহাতে যে আমাদের অনেক উপকার হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাতায়াতের বড়ই সুবিধা হইয়াছে। পূর্ব্বে যেখানে বহু কষ্ট সহ্য করিয়া এক মাসে যাওয়া যাইত, এখন সেখানে অনায়াসে এক দিনে যাওয়া যায়। টেলিগ্রাফের প্রসাদে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শত শত ক্রোশস্থিত বন্ধুবান্ধবের সমাচার পাইয়া থাকি। কোন স্থানে দুর্ভিক্ষ হইলে, রেলরোডের সাহায্যে দেশের চারিদিক হইতে সেখানে ভক্ষ্য দ্রব্য আনা যায়। যেখান দিয়া রেল রোড গিয়াছে, সেখানকার ফসলের দাম চড়িয়াছে; কৃষকের লাভ হইয়াছে। গতিবিধির সুবিধা হওয়াতে, বাঙ্গালী, পঞ্জাবী, মহারাষ্ট্রী মান্দ্রাজী সকলে মিলিয়া মিশিয়া কায করিতে সক্ষম হইয়াছে; পরস্পরের সৌহৃদ্য বাড়িতেছে।

জগতে প্রায় কিছুই অমিশ্রিত ভাল বা অমিশ্রিত মন্দ নাই। যাহাকে ভাল বলি, সাধারণত তাহার অর্থ তাহাতে ভালর অংশ অধিক; যাহাকে মন্দ বলি, সচরাচর তাহার অর্থ তাহাতে ভালর অপেক্ষা মন্দর ভাগ অধিক। রেলরোড যে কেবলই আমাদের উপকার বা উন্নতির সহায়তা করিতেছে তাহা নহে। ইহা দ্বারা ক্ষতিও হইতেছে।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়া রেলরোডের ভাল মন্দ উভয় পক্ষ বিচার করিয়া দেখা যাউক। সম্প্রতি ছত্রিশগড়ের ভিতর দিয়া নাগপুর-বেঙ্গল রেলরোড গিয়াছে। পূর্ব্বে সেখানে ফসল

অপর্য্যাপ্ত হইত, এবং অতিশয় শস্তা ছিল; এমন কি, শুনা যায়, কখন কখন খেত হইতে সমুদয় শস্য লওয়া হইত না, সেইখানেই পচিয়া যাইত। রেলরোডের পূর্ব্বে যে কখনও ছত্রিশগড়ে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, শুনা যায় নাই। এক্ষণে, রেল-রোডের দরুণ ছত্রিশগড়ের ফসলের মূল্য বাড়িয়াছে; পূর্ব্বে যেখানে চাউলের সের ২ পয়সা ছিল, এক্ষণে সেখানে ৪ পয়সা হইয়াছে। কৃষকের ইহাতে কম লাভ নহে!

কিন্তু প্রথমত, অন্তত সমুদয় লাভ কৃষকের ঘরে যায় না। কৃষকেরা অনেক কায মজুর দিয়া করায়। শস্যের দাম চড়িয়া যাওয়ায়, মজুরদিগের মজুরি কিছু বাড়িয়াছে, যদিও যতদূর বাড়া উচিত ততদূর বাড়িয়াছে কি না সন্দেহ। অতএব, লাভের কিয়দংশ মজুরদিগকে না দিলে, তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন অসম্ভব। যে জমি রেলরোডের যত নিকটবর্ত্তী, তাহার খাজনা তত বেশি হইয়া থাকে। অতএব লাভের আর এক অংশ চলিয়া যায়।

দ্বিতীয়ত, শিল্পজীবিদের দুরবস্থা। এখনও ছত্রিশগড়ে সহস্র সহস্র তন্তুবায় আছে, এখনও কোন কোন স্থানের লোকেরা লৌহ গলাইয়া জীবন ধারণ করে। রেলরোডের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী কাপড় এবং বিলাতী লোহার বিস্তার হইলে ইহাদের অন্ন মারা যাইবে। তখন ইহারা কৃষিকার্য্য বা মজুরি অবলম্বন করিবে। সকল লোকই কৃষক এবং মজুর হইলে, জননী বসুন্ধরা ক্রমে তাহাদের খাদ্য যোগাইতে নিশ্চয়ই অসমর্থ হইবেন।

তৃতীয়ত, শস্যের রপ্তানি বৃদ্ধি। রেলরোডে শস্যের রপ্তানির সুসার করিয়া দেয়। পূর্ব্বে বলদের পৃষ্ঠে অল্প স্বল্প শস্য ছত্রিশগড়ের বাহিরে যাইত। এক্ষণে শত শত মণ চাউল, গম রেলগাড়ীতে লইয়া যায়। পূর্ব্বে কোন বৎসর ফসল কম হইলে, সঞ্চিত শস্য থাকা প্রযুক্ত লোকের বিশেষ কষ্ট হইত না। এক্ষণে, অধিক দাম পাইয়া টাকার লোভে, আপনাদের নিতান্ত যাহা দরকার তাহা রাখিয়া, সমুদয় উদ্বৃত্ত শস্য কৃষকেরা বিক্রয় করে। এক্ষণে সঞ্চিত ফসল অতি অল্পই থাকিবে। সুতরাং, দুর্বৎসরে বিশেষরূপে অন্নকষ্ট হওয়া সম্ভব।

চতুর্থত, টাকার অপব্যয়। এস্থলে কেহ কেহ বলিবেন, কৃষকেরা ত যে শস্য বিক্রয় করে, যাহা তাহাদের দেশ হইতে বিদেশে চলিয়া যায়, তাহার উচিত মূল্য পাইয়া থাকে। পূর্ব্বে না হয় শস্য সঞ্চয় করিয়া রাখিত, এখন তাহার পরিবর্ত্তে টাকা জমাইয়া রাখিবে। দুর্ভিক্ষ হইলে, রেলরোডে অন্য স্থান হইতে খাদ্য যোগাইবে, কৃষকেরা সঞ্চিত টাকা দিয়া তাহা কিনিবে। কথাটি শুনিতে বেশ; কিন্তু যিনি কৃষকেরা সচরাচর কিরূপ লোক জানেন তিনি ওরূপ কথা বলিবেন না। সচরাচর তাহারা অতিশয় অদূরদর্শী; ভবিষ্যতের ভাবনা বড় ভাবে না। অশিক্ষিতলোকের স্বভাব এইরূপই হইয়া থাকে। হাতে টাকা পাইলে, প্রায়ই তাহারা খরচ করিয়া ফেলে। টাকা যেরূপ খরচ করা যায়, সঞ্চিত চাউল বা গম সেরূপ করা যায় না। অনেক চাসারা মদ খাইয়া থাকে। হাতে টাকা পাইলে, তাহারা যে মাত্রা চড়াইবে তাহাতে সন্দেহ কি?

আবার, রেলরোডে অনেক চাকচিক্যশালী, কিন্তু অনাবশ্যকীয় বিলাতীয় জিনিশ চাসার দ্বারে হাজির করিবে, খরচের পথ প্রশস্ত করিয়া দিবে। অশিক্ষিত লোকদিগের মন "রাঙ্গা চোঙ্গা" খেলনা জিনিসে ভুলিয়া যায়। হাতে টাকা থাকিলে, ভবিষ্যতে দুর্বৎসরে কি খাইবে, ইত্যাদি ভাবিয়া যে উহার ক্রয় হইতে বিরত হইবে তাহা সম্ভব নহে। যেখানে মোটাকাপড়ে আরামে চলিত সেখানে চকচকে সাটিন বা বনাত চাই; যেখানে ২ পয়সার দেশীখেলনায় ছেলেরা আনন্দে নাচিত, সেখানে তাহার আটগুণ দামের খেলনা ব্যতীত তাহাদের চিত্তাকর্ষণ করিবে না। এইরূপ একদিকে যেরূপ কৃষকেরা রেলবিস্তারের জন্য অধিক টাকা পাইবে, সেইরূপ অন্যদিকে উহার নিরর্থক ব্যয়েরও উপায় বাড়িবে। অধিকন্তু, আগে যে দুর্বৎসরের জন্য সঞ্চিত শস্য দেশে থাকিত এখন আর তাহা থাকিবে না। যাহার যেরূপ আয়, তদনুযায়ী সে খেলনা প্রভৃতিতে যদি খরচ করে, তবে সেরূপ খরচ কুফলদায়ক হয় না। কিন্তু অশিক্ষিত লোকেরা আপনাদের আয় বুঝিয়া অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া, খরচ করিতে প্রায়ই অক্ষম দেখা যায়।

ভারতবর্ষের একটি বিভাগ সম্বন্ধে রেলরোডের যেরূপ কুফল ফলিতেছে এবং ফলিবে দেখা গেল, অন্যান্য স্থান সম্বন্ধেও সেইরূপ কুফল ফলিয়াছে। রেলরোড তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যবসায়-জীবিদিগের অবস্থা খারাপ করিয়াছে, বা খারাপ করিতে সাহায্য করিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশ বাধ্য হইয়া কৃষিজীবি হইয়াছে। একদিকে জমির উৎপাদিকা

শক্তি কমিতেছে; কর্ষণ-যোগ্য পতিত জমি নিতান্ত অস্বাস্থ্য-কর পার্ব্বত্য প্রদেশ ভিন্ন অন্যত্র অতিকমই দেখা যায়, বা দেখা যায় না। অন্যদিকে, পূর্ব্বে যাহারা শিল্পকার্য্যে জীবনধারণ করিত, এখন তাহারা কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়াছে; কৃষকের জীবন-সংগ্রাম দিন দিন ভীষণতর হইতেছে; চারিদিকে অন্নকষ্ট বাড়িতেছে।

রেলরোড আমাদের সভ্যতাকল্পে কিরূপ সাহায্য করে পূর্ব্বে বলা গিয়াছে। কিন্তু, বস্তুত, উহা আমাদের সভ্যতার নিদর্শন নহে। ভারতবর্ষে অন্যূন নয়হাজার মাইল রেলরোড আছে, এবং তৎসঙ্গে সোন, যমুনা প্রভৃতি বড় বড় নদীর উপর বৃহৎ বৃহৎ সেতু দেখা যায়। আমরা ঐসকল রেলরোডে ভ্রমণ করি এবং সেতুর নির্ম্মাণনৈপুণ্যের তারিপ করি, কিন্তু ঐ সকল রেলরোড এবং সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছে, কাহারা? ব্রিটনবাসীরা। উহা বিলাতী বা পাশ্চাত্য সভ্যতার পরিচায়ক, আমরা যে ঐ সভ্যতা পাইয়াছি, তাহা আদৌ প্রকাশ করে না। ঐ সকল রেলরোড নির্ম্মিত হইয়াছে ব্রিটিস ইঞ্জিনিয়ার দ্বারা; উহার নির্ম্মাণে যে মূলধন লাগিয়াছে তাহার অধিকাংশ যোগাইয়াছেন ব্রিটনবাসীরা; উহা পরিচালিত হয় ব্রিটনবাসীদ্বারা। ষ্টেসনমাষ্টারগিরি, অথবা কোন কোন ক্ষুদ্র রেলওয়েতে মধ্যে মধ্যে গার্ড বা ড্রাইভারগিরি ছাড়া ভারতবাসী ভারতীয় রেলওয়েতে কোন বড় কাযে নিযুক্ত দেখা যায় না। ভারতবাসী যে অপারক সে কথা হইতেছেনা; রেলওয়ে সম্বন্ধে তাঁহার প্রকৃত অবস্থা কি তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। এরূপ আলোচনা করিলে রেলরোডের বিস্তারে

আমাদের কোন গৌরবের বা আত্মপ্রসাদের কারণ দেখা যায় না।

রেলরোড সম্বন্ধে যাহা বলাগেল টেলিগ্রাফ এবং বড় বড় খাল সম্বন্ধেও তাহা খাটে। ইহাও ব্রিটিস ইঞ্জিনিয়ারদ্বারা নির্ম্মিত এবং পরিচালিত—ইহাও ব্রিটিসদিগের উন্নতির পরিচায়ক, আমাদের নহে।

রেলরোডের ভাল মন্দ দেখা গেল। পাঠক, ওজন করিয়া কোনটা গুরুতর দেখিবেন। কেহ কেহ মন্দটাই গুরুতর মনে করিবেন। তাঁহাদের এরূপ মনে করিবার একটি বিশেষ কারণ আছে যাহার উল্লেখ করা হয় নাই। ভবিষ্যতে যদি ভারতবাসী এরূপ সভ্য হয়, যে তাহারা আপনাদের চেষ্টাতে, আপনাদের টাকাতে, আপনাদের বিদ্যাবুদ্ধিতে বিস্তীর্ণ রেলরোড প্রস্তুত করিতে পারে, তখন তাহারা দেখিবে যে সমুদায় পথ বন্ধ। যেখানে রেলরোড করিলে লাভের সম্ভাবনা, সেখানে রেলরোড প্রস্তুত রহিয়াছে। বর্ত্তমান রেল-রোডে আমাদের উন্নতি হয় নাই প্রকাশ করে, দেখা গিয়াছে; ভবিষ্যতে যে উন্নতি হইবে, তাহারও পথ বন্ধ করিয়াছে।

তবে কি এত রেলরোড না হইলে ভাল হইত? ইহার উত্তরে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, যদি প্রকৃত স্থায়ী উন্নতি বাঞ্ছনীয় হয়, যদি তাহার জন্য আশুলাভে বঞ্চিত হওয়া ভাল হয়, তাহা হইলে না হইলেই ভাল ছিল। ব্রিটিসকৃত এবং ব্রিটিসচালিত ৯ হাজার মাইল রেলরোডের পরিবর্ত্তে, যদি ভারতবাসীকৃত এবং ভারতবাসী-চালিত ৯০ মাইল রেল-

রোড দেখিতাম, তাহা হইলে ভারতবাসীর উন্নতির পরিচয় পাওয়া যাইত।

৪। শিক্ষার বিস্তার। শিক্ষার বিস্তার ব্রিটিশরাজ্যের প্রধান গৌরব। তাহাতে আমাদের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই। শাক্যসিংহের সময় হইতে চৈতন্যের সময় পর্য্যন্ত অনেক ধর্ম্মসংস্কারক বর্ণভেদের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু দুই সহস্র বৎসরের প্রচারে যে ফল ফলে নাই, এক শত বৎসরের পাশ্চাত্য শিক্ষায় সে ফল ফলিয়াছে; বর্ণভেদের মূলে কুঠারাঘাত লাগিয়াছে। পূর্ব্বে উচ্চশিক্ষা অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণের অধিকার ছিল: এক্ষণে উহা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ শূদ্র সকলেরই সম্পত্তি। বিদ্যালয়ের ভিতরে উচ্চ নীচ সকল জাতিকেই একত্রে একই বিষয় পড়িতে হয়; পরীক্ষায়, পুরস্কারে উচ্চ নীচ প্রভেদ নাই। বিদ্যালয়ের বাহিরে, চাকরি, মান, সম্ভ্রম উচ্চ নীচ সকলেরই সমান প্রাপ্য। তেলি, তামুলি, চাসাধোপা প্রভৃতি যে সকল জাতি সমাজে হেয় বলিয়া পরিগণিত ছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সমাজের নেতৃদলে পরিগণিত হইয়াছেন। বর্ণনির্ব্বিশেষে সকল মনুষ্যেরই যে মনুষ্যত্বে অধিকার, পাশ্চাত্য শিক্ষা সেই সাম্য-ভাবটি বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছে। উহার প্রভাবে অনেক কুসংস্কার তিরোহিত হইতেছে। কোন সময়ে কোন পদার্থ কোন ব্যক্তি বা সমাজ-বিশেষ দ্বারা অখাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল; তাহা উদরস্থ বা এমন কি স্পর্শ করিলে তুমি সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইবে। জাহাজে চড়িলে পাপ হইবে। নীচবর্ণের সহিত খাইলে জাতি হারাইবে। বিধবা-

বিবাহ করিলে একঘরে হইবে। এই প্রকার যে সকল কুসংস্কার আমাদের সমাজকে কষিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে দিতেছিল না, তাহার বন্ধন ক্রমশই শিথিল হইয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, সংসারে অমিশ্রিত ভাল জিনিস প্রায় নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষারও আনুসঙ্গিক কুফল আছে। বহু-কাল বাঁধাবাঁধির ভিতর থাকিয়া সহসা স্বাধীনতা পাইলে সে স্বাধীনতার কুব্যবহার অসম্ভব নহে। হিন্দুসমাজে সুরাপান নিষিদ্ধ ছিল। ইংরাজি-শিক্ষিত যুবকেরা দেখিলেন, সুরা-পানের সহিত ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই; তাঁহাদের যাঁহারা আদর্শ স্থল সেই ইংরাজেরা সুরাপান করিয়া থাকেন। তাঁহারা সুরাপান আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা হিন্দু সমাজের মত মানেন না; বৃদ্ধ হিন্দুরা "ওল্ড ফুল", তাহারা কি জানে? তাহারা ত সেক্সপিয়র মিল্‌টন পড়ে নাই। ইংরাজসমাজে পানাহার স্ত্রীপুরুষ একত্রে হইয়া থাকে, পানের মাত্রাধিক্য কতকটা ঘৃণিত। হিন্দুসমাজে "মাৎলামীর" এ প্রতিবন্ধকটুও নাই; শ্রাদ্ধ বেশি দূর গড়াইল। অনেক কৃতবিদ্য লোক সুরামত্ত হইয়া পশুবৎ আচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। উচ্চশিক্ষায় কোথায় উন্নতি হইবে, না অনেকের সম্বন্ধে প্রকৃতপক্ষে অধোগতি হইল!

হিন্দুসমাজে অখাদ্য সম্বন্ধে বড়ই কষাকষি ছিল। অখাদ্যের মধ্যে কোনও জিনিস এদেশে বাস্তবিক খাওয়া উচিত কি না, ইংরাজিশিক্ষিত যুবকেরা তাহার বিচার করিলেন না। নিজের ধর্ম্ম, নিজের মত যাহাই হউক, অন্যে যে ধর্ম্মে বিশ্বাস করে,

অন্যে যে মত অবলম্বন করে তাহার প্রতি কতকটা শ্রদ্ধা প্রদর্শন মনুষ্যোচিত কার্য্য। ইংরাজিশিক্ষিত যুবকেরা গোমাংস ভক্ষণ করিয়া গরুর হাড় হিন্দুর সম্মুখে ফেলিতে লাগিলেন! দিন কত তাঁহাদের অত্যাচারের বড়ই বাড়াবাড়ি হইয়াছিল।

পূর্ব্বে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে আমাদের কতকটা উন্নতি হইয়াছে বলা গিয়াছে। কিন্তু যতটা উন্নতির আশা করা যায় বা বাঞ্ছনীয়, তাহার সঙ্গে তুলনা করিলে অতি অল্পই হইয়াছে। তাহার একটি কারণ, গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসিকে উচ্চ উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত করেন না। অতএব, ভারতবাসির মনোবৃত্তির সম্যক্ প্রস্ফুটন হয় না। মুসলমান-সময়ে অনেক অত্যাচার ছিল; কিন্তু উচ্চ উচ্চ পদ সম্বন্ধে হিন্দু মুসলমানে বিশেষ প্রভেদ ছিল না। সম্রাটপ্রবর আকবারের সময়ে ভগবান-দাস, মানসিংহ, টোডরমল্ল, রায় রায়সিংহ, বীরবল্ল প্রভৃতি অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ছিলেন তাহা অনেকেই জানেন। সম্রাট ফিরোক সাহের সময় রতনচাঁদের বিশেষ প্রভুত্ব ছিল। একজন মুসলমান ইতিহাস-লেখক বলিয়াছেন, যে হিন্দু রতনচাঁদের সম্মতিব্যতীত কোন মুসলমান কাজি হইতে পারিত না। রায় আলমচাঁদ এবং জগৎশেট সুজাখাঁর দুই জন সচিব ছিলেন। জানকীরায় আলিবর্দ্দি খাঁর মুখ্য সচিব ছিলেন। জগদেও গোলকণ্ডের রাজা ইব্রাহিম খাঁর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। দিল্লির সম্রাট মহম্মদ সার সময়ে সাম্রাজ্যের ভার হেমু নামক জনৈক হিন্দুর উপর ন্যস্ত হইয়াছিল; হেমু একজন সামান্য দোকান-দার হইতে এই উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়। ইংরাজ ইতিহাস-লেখক

এলফিনষ্টোন হেমুর ক্ষমতার অতি তারিপ করিয়াছেন। মোহনলাল, দুর্লভরায় এবং রামনারায়ণ, সিরাজদ্দৌলার তিনজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। সম্রাট বাবর তাঁহার জীবনীতে লিখিয়াছেন, যে তিনি যখন ভারতবর্ষে আসেন, রাজস্ব সম্বন্ধে ছোট বড় সকল কার্য্যেই হিন্দুরা নিযুক্ত ছিল, মুসলমান রাজ্যের ইতিহাস হইতে ভারতবাসীর উচ্চ উচ্চ পদে নিয়োগের আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু, এক্ষণে সামরিক বিভাগেরত কথাই নাই, অন্যান্য বিভাগেও যেখানে ভারতবাসীর উচ্চপদে থাকিলে স্বপ্নেও কোন হানির কল্পনা করা যায় না, সেখানেও কোন অত্যুচ্চ পদে তাঁহাকে দেখা যায় না। যাহাকে শিশুর ন্যায় ব্যবহার করা যায়, সে চিরকালই অনেকটা শিশুবৎ থাকে, মানবোচিত তাহার উন্নতি সম্ভবে না। যাহাকে ঘোড়ায় চড়িতে দিবে না, সে কখনও ঘোড়ায় চড়িতে শিখিবে না। যাহাকে দুরূহ কায করিতে দিবে না, সে দুরূহ কায করিতে যে উন্নতি হয় তাহাও কখন পাইবে না। কেবল কেরানিগিরি করিয়া জীবন ধারণ করিলে, উন্নতির বিশেষ আশা করা যায় না। শিক্ষিত যুবকদিগের একশত জনের মধ্যে প্রায় নিরেনব্বই জন কেরানিগিরি করিয়া উদর পূর্ত্তি করেন। তাহাতেও উমেদারি চাই; "লাগিটা আসটা" ও আছে। অতএব অধিকাংশ যুবক যে "মুসড়াইয়া" যায় তাহা আশ্চর্য্য নহে।

বিলাতী সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান ভিত্তি প্রকৃতি-বিজ্ঞান। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের উন্নতিতেই পাশ্চাত্য খণ্ডের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। মনোবিজ্ঞান দু হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যে

অবস্থায় ছিল, আজও অনেকটা সেই অবস্থায় আছে। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্রাচ্য মহাত্মারা ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য সাহিত্যে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেখা যায় না। কিন্তু প্রকৃতি-বিজ্ঞানের উন্নতিতে বর্ত্তমান পাশ্চাত্যেরা প্রাচীন প্রাচ্যদিগকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়াছেন। নানাবিধ কল কারখানা ঐ বিজ্ঞানোন্নতির ফল। পূর্ব্বে যাহা হাতে হইত, এখন তাহা অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে কলে হইয়া থাকে। তাই হস্ত-নির্ম্মিত শিল্প দ্রব্য কল-নির্ম্মিত শিল্প দ্রব্যের প্রতিদ্বন্দিতায় টিকিতে পারিতেছে না। ভারতীয় শিল্পের মৃত্যুর ইহাই একটি প্রধান কারণ; উহার পুনর্জ্জীবনের প্রধান আশা পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান।

কিন্তু, বিজ্ঞান-শিক্ষার বিস্তার ভারতবর্ষে অতি কমই হইয়াছে। বিলাতী সভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য বস্তুটি আজও আমরা পাই নাই। যাহা পাইয়াছি তাহার অধিকাংশ "মেকি"! ভারতবর্ষের অধিকাংশ কল কারখানা ইউরোপীয়দিগের; খনিকার্য্যও প্রায় তাঁহাদের একচেটিয়া। যতদিন এরূপ অবস্থা চলিবে, ততদিন আমাদের বিশেষ উন্নতি হইবে না, ততদিন আমাদের দারিদ্র্যের লাঘব হইবে না। দারিদ্র্য না ঘুচিলে আমাদের বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা নাই। যাহারা উদরের ভাবনায় জ্বালাতন, যাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক দুইবেলা উদর ভরিয়া খাইতে পায় না, কেরানিগিরি বা কুলিগিরি করিয়া কত অপমান, কত কষ্ট সহ্য করিয়া কোনমতে জীবন ধারণ করে, তাহাদের পক্ষে সভ্যতা বিড়ম্বনা মাত্র।

অতি আহ্লাদের বিষয় বিজ্ঞান-শিক্ষার উপর ক্রমে আমাদের দেশের লোকের চোখ পড়িতেছে। স্থানে স্থানে কল কারখানাও স্থাপিত হইতেছে। বিলাতী সভ্যতার প্রধান ভিত্তি কি, ক্রমে আমরা দেখিতে পাইতেছি; ক্রমে আমাদের চোখ খুলিতেছে, কিন্তু একটু শীঘ্র শীঘ্র চোখ খুলিলে ভাল হয়। নহিলে যখন চোখ খুলিবে, দেখিবে যে অনেক দিকেই উন্নতির পথ বন্ধ হইয়াছে।

পাশ্চাত্য-শিক্ষার বিস্তারে দেশীয় সাহিত্যের অনেক উপকার হইয়াছে। অনেক ইংরাজি পুস্তকের অনুবাদ হইয়াছে; অনেক ইংরাজি গ্রন্থ হইতে ভাব বা সাহায্য লইয়া দেশীয় ভাষায় পুস্তক রচিত হইয়াছে। অনুবাদে তত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না; কিন্তু শেষোক্ত পুস্তক রচনাতে বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন। উহাতে উদ্ভাবনী এবং চিন্তাশক্তির আবশ্যক। দুঃখের বিষয়, এরূপ গ্রন্থের সংখ্যা বিরল, এবং আরও দুঃখের বিষয় বড় বাড়িতেছে না। পনর বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্য উন্নতিপথে যেরূপ অগ্রগামী হইতেছিল, এখন সেরূপ হইতেছে না। সম্ভবত, একটি কারণ দেশীয় ভাষার তত আদর নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় উহার প্রবেশ হইলে উন্নতির সম্ভাবনা। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার জন্য চেষ্টা করা হইয়াছিল; কিন্তু সে চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছে।

হিন্দুসমাজে বিলাতী সভ্যতা। কোন কোন স্থানের অসভ্য জাতিরা প্রভূত পরাক্রমশালী ইউরোপীয়দিগকে দেবতা মনে করিয়াছিল। শক্তিপূজা মনুষ্যের প্রকৃতি।

ক্ষমতাবান্ পুরুষ, বড়লোক, দেবতাবৎ পূজিত হন; জনসাধারণে তাঁহার সবই ভাল দেখেন, মন্দবিষয়ে অল্প। যে জাতি বুদ্ধি এবং বীর্য্যবলে এত বড় একটা দেশকে শাসনে রাখিয়াছে; যে জাতির কীর্ত্তি বসুন্ধরাব্যাপী, যাহার সাম্রাজ্যে সূর্য্যাস্ত হয় না, সেই জাতিকে আমাদের মত হীনবল, বিজিত, বর্ত্তমানে অনেক বিষয়ে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতি যে ভয়, মান্য এবং "পূজা" করিবে, তাহা বড় আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

অনেক শিক্ষিত যুবকদিগের নিকট ইংরাজ সমাজ আদর্শ সমাজ। অনেক সময়ে ইহা অজ্ঞানত; প্রকাশ্যে অনেকে ইহা স্বীকার করিবেন না; তথাপি, জানত হউক আর অজ্ঞানত হউক, ইংরাজের রীতিনীতি আচার ব্যবহার অনেকেই অনুসরণ করিয়া থাকেন। চোখ খুলিয়া অনুসরণ করাতে উপকার ব্যতীত অপকারের সম্ভাবনা নাই। ইংরাজদিগের নিকট হইতে শিখিবার আমাদের অনেক বিষয় আছে। তবে, আমাদের সমাজের কোন্ রীতিগুলি বাস্তবিক মন্দ, ইংরাজ সমাজের কোন্ রীতিগুলি বাস্তবিক ভাল, এবং আমাদের অবলম্বনীয়, ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা বিধেয়। অন্ধ অনুকরণ অতিশয় দূষ্য।

ইংরাজ সমাজের সংযোগ এবং পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে, হিন্দুসমাজের কয়েকটি কুনিয়মে বিশেষরূপে আঘাত লাগিয়াছে। ঐ সকল কুনিয়ম হিন্দুসমাজকে এরূপ ভাবে জড়াইয়াছে, এরূপ কষিয়া "আকড়াইয়া" ধরিয়া রহিয়াছে, যে উহাকে বাড়িতে দিতেছে না। উহাদের সমূলে উচ্ছেদ অনেক দিনের কথা। এখন উহাদের বন্ধন কিঞ্চিৎ শিথিল

হইয়াছে মাত্র—তাহাও কম লাভ নহে। বর্ণভেদে আমাদের কতকটা উপকার হইয়াছে, সত্য; কিন্তু অনুপকার হইয়াছে অনেক। বর্ণভেদ হিন্দু সমাজকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া। এক্ষণে, বর্ণভেদের আঁটা-আঁটি কিছু কমিয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে অনেকে অখাদ্য ভক্ষণ সম্বন্ধেও নিয়মরক্ষা করিতে বিরত হইয়াছেন। ব্রিটিস-রাজ্যে সতীদাহ বন্ধ হইয়াছে। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগরের উদ্যমে বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে। বহুবিবাহ এবং বাল্য-বিবাহ প্রথাগুলি যে মন্দ তাহা আমরা ক্রমে বুঝিতে পারিতেছি। স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার হইতেছে। ইংরাজ সমাজের সংযোগে হিন্দুসমাজের এই প্রকার অনেক উপকার হইতেছে।

অনুপকারও হইয়াছে, অন্ধানুকরণ দোষে; যথা, সুরাপানের প্রাদুর্ভাব। ইংরাজি শিক্ষিত যুবকেরা বুঝি মনে করিলেন, ইংরাজেরা পান করেন, হয়ত পানেই তাঁহাদের বীর্য্য।

ভারতবাসী প্রধানত নিরামিসভোজী, মৎস্য মাংস অতি-কমই খাইয়া থাকে। এক্ষণে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ খাটনি বাড়িয়াছে তাহাতে তাহাদের পক্ষে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে মৎস্যমাংস ভক্ষণ বিধেয়। ইহা সর্ব্ব-বাদিসম্মত নহে। উদ্ভিদে যথেষ্ট পুষ্টিকর পদার্থ আছে, এবং মাংসে শরীরের হানি হয়, অনেকের এইরূপ মত। সে যাহা হউক, অপরিমিত মাংসভোজনে যে নানা পীড়া জন্মে তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব অতিরিক্ত মাংস ভক্ষণ দূষণীয়, বিশেষত ভারতবর্ষের ন্যায় উষ্ণপ্রধান দেশে। ইউ-রোপীয়েরাও, যাঁহারা বহুকাল হইতে মাংসভোজী, ক্রমে

ইহা বুঝিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যেও কেহ কেহ হিন্দুর দুই একটি অখাদ্য মাংস খান না। মাংস ভোজনে অত্যাচার, হিন্দুসন্তানের স্বাস্থ্যের হানিজনক হইবার সম্ভাবনা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে, পরে মুন্সেফি, মাষ্টারি, ওকালতি, কেরানিগিরি বা অন্যান্য চাকরি করিতে বিশেষরূপে মানসিক পরিশ্রম হয়; কিন্তু তদনুযায়ী শরীরপরিচালনা হয় না। বহুমূত্রাদি যে সকল নূতন রোগের আজকাল এত প্রাদুর্ভাব হইয়াছে উহাই তাহার প্রধান কারণ বলিয়া অনুমিত হয়। পাশ্চাত্য সভ্যতায় ব্যায়াম চর্চ্চার বিশেষ আদর। সৌভাগ্যের বিষয়, সম্প্রতি আমাদের এদিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে।

পূর্ব্বকালের লোকদিগের দান এবং অতিথিসৎকার বিশেষ গুণ ছিল। নব্যসম্প্রদায়ে ঐ সকল গুণ তত দেখা যায় না, স্বার্থপরতা বাড়িয়াছে। তাহার একটি কারণ, যেরূপ আয় তাহার তুলনায় ব্যয় অধিক পরিমাণে বাড়িয়াছে। আমাদের মধ্যে যাঁহার কিছু টাকা হয়, তাঁহার আত্মীয় স্বজন অনেককে প্রতিপালন করিতে হয়; কারণ আমাদের সমাজ অতি দরিদ্র। পূর্ব্বাপেক্ষা খাদ্যসামগ্রীর মূল্য বাড়িয়াছে। পূর্ব্বে এখনকার মত কাপড় চোপড়, জুতা, খেল্না, এবং অন্যান্য বিলাতী জিনিসের প্রচলন ছিল না। এখন পরিবারস্থ সকলের এ সকল জিনিস অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

বাল্যবিবাহ প্রভৃতি যে সকল দূষণীয় প্রথা আমাদের সমাজে প্রচলিত দেখা যায়, তাহার নিরাকরণ বাঞ্ছনীয় হইলেও, অতি সতর্কতার সহিত আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। ঐ সকল প্রথা অতি প্রাচীন, উহাদের পক্ষে বলি-

বার অনেক কথা আছে, ইহা আমাদের মনে রাখা আবশ্যক। আইনের সাহায্যে, ভয় দেখাইয়া, বলপ্রয়োগ করিয়া, উহাদের বিনাশ করিতে চেষ্টাকরা বিধেয় নহে। অনেক সমাজ আছে যেখানে বাল্য বিবাহ নাই এবং বিধবাবিবাহ প্রচলিত, অথচ উহারা অসভ্য। লেপ্টা প্রভৃতি বহুতর অসভ্য জাতিরা অধিক বয়সে বিবাহ করিয়া থাকে ; বিধবা বিবাহেও তাহাদের এবং অনেক শূদ্রজাতির কোন আপত্তি নাই। যে সকল সমাজ সংস্কারকেরা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে প্রাচীন সামাজিক প্রথাসকল উঠাইয়া দিতে চান তাঁহারা জানেন না যে, তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইলেও আকাঙ্খিত ফললাভের আশা বড়ই কম। যে সংস্কার, যে উন্নতি, আমরা আপনারা শিক্ষার প্রভাবে, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া করিতে পারিব তাহাই স্থায়ী এবং সাস্থ্যজনক উন্নতি হইবে।

বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান-শিক্ষা।

শিল্প এবং খনিকার্য্যের বিস্তার ব্যতীত ভবিষ্যতে আমাদের জীবনধারণ দুরূহ হইবে, এবং ইহার জন্য বিজ্ঞানচর্চ্চার বিশেষ প্রয়োজন। অন্যান্য কারণেও রিজ্ঞান-শিক্ষা বিশেষরূপে বাঞ্ছনীয়। প্রকৃতির পুস্তকপাঠে মন যেরূপ উন্নত ও প্রশস্ত হয়, বিজ্ঞানের আলোকে অজ্ঞানান্ধকার যেরূপ শীঘ্র তিরোহিত হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। বিজ্ঞানের

রাজ্য চারিদিকে বিস্তৃত হইতেছে। ভাষা, ইতিহাস, প্রভৃতি পাঠ্য বিষয়েও বৈজ্ঞানিক প্রথা প্রচলিত হইতেছে। বস্তুতঃ বিজ্ঞানশিক্ষার আবশ্যকতা আজকাল এরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়াছে যে, তদ্বিষয়ে অধিক কিছু বলা, সময় নষ্ট করা মাত্র।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকাল বিজ্ঞানশিক্ষার যাহাতে বিস্তার হয়, তাহার চেষ্টা দেখা যাইতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্রেরা অধিক বয়স্ক; এবং তাঁহাদের পঠিতব্য পুস্তক ইংরাজি। বিজ্ঞানের সম্যক চর্চ্চার জন্য তরুণ বয়সেই উহার শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। এরূপ শিক্ষা মাতৃভাষাতেই উত্তমরূপে সম্ভব। তাহা ছাড়া, ছাত্রবৃত্তি এবং মাইনর পরীক্ষার্থী ছাত্রেরা বাঙ্গালা পুস্তকের উপর প্রায় সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। অতএব বিজ্ঞানবিষয়ক বাঙ্গালা পুস্তকের প্রয়োজন। ইহা নূতন কথা নহে; অনেক দিন পূর্ব্বে এই প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হইয়াছে, এবং কতকগুলি বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তকও বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে চলিতেছে। যতগুলি অমরা দেখিয়াছি, সমস্তই ইংরাজি বই হইতে অনুবাদিত বা সঙ্কলিত। কিন্তু অনুবাদ বা সঙ্কলন যে সহজ কায নহে, তাহা যিনি বিজ্ঞানবিষয়ে বাঙ্গালায় লিখিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি বিলক্ষণরূপে জনেন। অতএব যাঁহারা যত্ন এবং কষ্ট করিয়া প্রথমে এই দুরূহ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন, বাঙ্গালা-বিজ্ঞান-ভাষা গড়িতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট বঙ্গভাষা বিশেষরূপে ঋণী।

দিন দিন বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, নূতন নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইতেছে, কত পুরাতন মত বদলাইতেছে। অতএব,

কোন বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পুস্তক লিখিতে হইলে, তৎসম্বন্ধে সম্প্রতি, ২।৪ বৎসরের মধ্যে, এমন কি ২।৪ মাসের মধ্যে যে সকল নূতন আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক।

আবার, যাহা সত্য তাহা বরাবরই সত্য রহিবে, কখনও মিথ্যা হইবে না। কিন্তু সত্য ব্যতীত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পুস্তকে অনেক মতামত প্রকাশিত হয়, যাহা অনেকটা কল্পনা-প্রসূত, অতএব পরির্ত্তনশীল। ঐ সকল পুস্তক হইতে অনুবাদ এবং সঙ্কলন করিতে হইলে অপরিবর্ত্তনীয় সত্য হইতে এরূপ মতামতের প্রভেদ জানা আবশ্যক। বৈজ্ঞানিক পুস্তকে আর একটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। রচনা সাধ্যমত হৃদয়গ্রাহী করিতে চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু, তাহা করিতে হইলে যদি সত্যকে বিকৃত করিতে হয়, তাহা করা কোন ক্রমেই বিধেয় নহে। ভুল শিক্ষাকরা অপেক্ষা অশিক্ষিত অবস্থায় থাকা ভাল, বিশেষতঃ সুকুমারমতি বালকদিগের পক্ষে।

বাঙ্গালা ভষায়, কি অন্য যে কোন ভাষায়, বৈজ্ঞানিক পুস্তক রচনা করিতে হইলে, এই তিনটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। ইহা অতিশয় শক্ত কার্য্য। যিনি যে বিজ্ঞানে পারদর্শী, তিনি সেই বিজ্ঞান-সম্বন্ধীয় পুস্তক ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে ইহা ভালরূপ করিতে পারেন কি না সন্দেহ। আমরা কয়েকখানি প্রচলিত গ্রন্থ হইতে আমাদের অর্থ পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করিব।

৺অক্ষয়কুমার দত্ত বাঙ্গালাভাষার একজন স্রষ্টা। তাঁহার নিকট আমারা চিরঋণী। তাঁহার ভাষা সরল এবং হৃদয়গ্রাহী,

রচনা-কৌশল অতি চমৎকার। তাঁহার 'চারুপাঠ' নামক গ্রন্থ অনেক দিন হইতে বিদ্যালয়ে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। অক্ষয়বাবু বিজ্ঞান বড় ভাল বাসিতেন, বিজ্ঞান চর্চ্চার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। 'চারুপাঠে' বিজ্ঞান-বিষয়ক অনেকগুলি প্রবন্ধ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সকলগুলিরই বিষয় উত্তম-রূপে বাছা হইয়াছে; সকলগুলিরই ভাষায় অক্ষয় দত্তের ছাপ লক্ষিত হয়। আমরা নিতান্ত বাধ্য হইয়াই উহাদিগের দোষ দেখাইতেছি।

চারুপাঠ প্রথম ভাগের বিজ্ঞান-বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব,—'আগ্নেয়-গিরি'। উহার প্রথম ছত্র এই—

"কোন কোন পর্ব্বতের শিখরদেশে অতি গভীর গহ্বর থাকে, তদ্দ্বারা মধ্যে মধ্যে ধূম, ভস্ম, অগ্নিশিখা, প্রস্তর, কর্দ্দম উষ্ণজল ও ধাতুনিস্রব প্রবলবেগে নির্গত হয়। সেই সকল পর্ব্বতের নাম "আগ্নেয়-গিরি।"

'আগ্নেয়-গিরি'র ইংরাজি প্রতিশব্দ 'বলকেনো'। প্রথমতঃ বলকেনো' কখন কখন আদৌ গিরির আকার ধারণ না করিতে পারে। করিলেও, কেবল শিখরদেশেই যে বলকেনোর' মুখ বিদ্যমান থাকে তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে, 'বলকেনো' গিরির আকার ধারণ করিলে, ঐ গিরির চতুষ্পার্শ্বে ছোট বড় অনেক গহ্বরের মুখ লক্ষিত হয়। ভূপৃষ্ঠের নিম্নদেশ (অর্থাৎ ভূগর্ভ) হইতে আগত ঊর্দ্ধগামী অত্যুত্তপ্ত ধাতব নিস্রবের ধারা যেখানেই ফাটা ফুটা পাইবে, অথবা স্বতেজে ফাটাফুটা করিয়া লইতে

* চারুপাঠ, প্রথমভাগ, দ্বিচত্বারিংশবার মুদ্রিত, কলিকাতা, ১৮৮৯। ৭ পৃষ্ঠা।

সক্ষম হইবে, সেইখান দিয়াই বহির্গত হইবে—কোন একটি নির্দ্দিষ্ট মুখ দ্বারাই যে ক্রমাগত নির্গত হইবে, তাহা কোন ক্রমেই ঠিক নহে। গহ্বরই বলকেনোর প্রধান অঙ্গ। ঐ গহ্বর অত্যন্ত গভীর। উহা দ্বারা যে সকল ধাতব নিস্রব বা প্রস্তর খণ্ড নির্গত হয়, তাহা গহ্বরের চতুষ্পার্শ্বে জমাট বাঁধিয়া বা রাশীকৃত হইয়া সচরাচর গিরির আকার ধারণ করিয়া থাকে বটে। কিন্তু ঐ গিরি যে গহ্বর দ্বারা নিস্রবাদি উৎক্ষিপ্ত হয়, তাহার ন্যায় বলকেনোর অত্যাবশকীয় অঙ্গ নহে। উহা নিস্রব বা প্রস্তর খণ্ড সমুহের উৎক্ষেপের ফলমাত্র। কেঁচোর বাস-স্থান সম্বন্ধে তাহার পায়ুপরিত্যক্ত মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত বল্মীক যেরূপ, 'বলকেনো' সম্বন্ধে 'বলকেনো' গিরি অনেকটা সেইরূপ; গহ্বর ব্যতীত বলকেনো থাকিতে পারে না; কিন্তু 'বলকেনো" গিরির আকার ধারণ না করিতেও পারে। অতএব 'বলকে-নোকে' আগ্নেয়গিরি বলা সঙ্গত নহে,এবং ঐ গিরির শিখরদেশেই যে 'বলকেনো'র গহ্বর থাকে তাহা নহে। আগ্নেয়গিরির পরিবর্ত্তে 'আগ্নেয় গহ্বর' শব্দটি ব্যবহার করিলে ভাল হয়।

দ্বিতীয়তঃ—'ধূম' 'ভস্ম' অগ্নিশিখা' দ্বারা সকলেই এরূপ বুঝিয়া থাকে যে, 'বলকেনো'র ভিতর কি যেন পুড়িতেছে, এবং সেই দাহ্যমান পদার্থ হইতে 'ধূম', 'ভস্ম', 'অগ্নি-শিখা' বাহির হইতেছে। কিন্তু বস্তুতঃ 'বলকেনো'র ভিতর দাহ্যমান কোনই পদার্থ নাই। উহা হইতে যে ধূম নির্গত হইতে দেখা যায়, তাহা বস্তুতঃ 'ধূম' নহে—প্রধানতঃ কুয়াসার ন্যায় জলীয়বাষ্প মাত্র। যাহা 'ভস্ম' বলিয়া বোধ হয়, তাহা সূক্ষ্ম পাথরের গুঁড়া। যাহা 'অগ্নিশিখা' বলিয়া আমাদের প্রতীতি হয়, তাহা আদৌ

'অগ্নিশিখা' নহে, অত্যুষ্ণ তরল নিস্রবের জ্যোতিঃ মাত্র; ইহা বাষ্পময় আকাশে প্রতিফলিত হইয়া অগ্নিশিখার ন্যায় দেখায়।

অতএব চারুপাঠে 'আগ্নেয়গিরির যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা ভ্রমসঙ্কুল বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। বাল্যকালে স্মরণশক্তি অতি প্রবল থাকে; ছাত্রেরা তখন যাহা শিখে তাহা শীঘ্র ভুলে না। তজ্জন্য অল্পবয়স্ক বালকদিগের শিক্ষা-সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক।

পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাবের তৃতীয় প্যারা (৮ পৃষ্ঠা)

"পদার্থবিৎ পণ্ডিতেরা এই পর্ব্বতাগ্নি উৎপন্ন হইবার যেরূপ কারণ দর্শাইয়া থাকেন, তাহা লিখিত হইতেছে। নারিকেলের মধ্যগত জলভাগ যেমন কঠিন আবরণে আবৃত, পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ তরল বস্তুরাশিও সেইরূপ কঠিন আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত। সাগরের জল যেমন কম্পিত হইয়া তরঙ্গ উপস্থিত করে, অবনীগর্ভস্থ উল্লিখিত অগ্নিময় মহাসাগরও সেইরূপ মধ্যে মধ্যে কম্পিত হইয়া তরঙ্গমালা উৎপাদন করে। ঐ তরঙ্গ লাগিয়া পৃথিবীর পৃষ্ঠ-দেশের কোন কোন স্থান কম্পিত, স্ফীত ও বিদীর্ণ হয়।" ইত্যাদি।

নারিকেলের মত পৃথিবীর অভ্যন্তর-ভাগ তরলপদার্থে পরিপূর্ণ কি না—তদ্বিষয়ে বিশেষ মতভেদ আছে। অনেক বড় বড় পণ্ডিতেরা ঐ মতের বিরোধী। বস্তুতঃ আজকাল উহা প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। কোন কোন ভূবিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিত প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, যে পৃথিবীর অভ্যন্তর-ভাগও উপরিভাগের ন্যায় কঠিন; তবে মধ্যে মধ্যে তরল

পদার্থপূর্ণ গহ্বর থাকিতে পারে। আবার, কেহ কেহ বলেন যে, কঠিন অভ্যন্তরভাগ এবং কঠিন উপরিভাগের মধ্যে তরল বা অর্দ্ধতরল পদার্থের একটি পাতলা স্তর বিদ্যমান আছে। যে মত সর্ব্ববাদি বা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত নহে, তদ্বিষয়ে বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া বিধেয় নয়। তা ছাড়া, এখানে এরূপ একটি মত শিখান হইতেছে, যাহার পরিপোষক আজকাল অতি বিরল।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে তরল পদার্থের 'অগ্নিময় মহাসাগর' আছে, স্বীকার করিলেও উহার তরঙ্গ লাগিয়া ভূপৃষ্ঠের কম্পন, বিদারণ ও উদ্গমন হয় মনে করা কবির কল্পনা হইতে পারে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক মত নহে। ভূগর্ভের তাপাতিশয্য প্রযুক্ত, তৎপ্রবিষ্ট জল বাষ্পাকারে পরিণত হয়। এই বাষ্পের প্রসারণ-শক্তি কিরূপ তাহা কেৎলিতে জল ফুটাইলে কতকটা বুঝা যায়। কেৎলির জল ফুটিলে, তাহার কিয়দংশ বাষ্প হইয়া যায়, এবং ঐ বাষ্প স্বীয় প্রসারণ শক্তি বলে কেৎলির ঢাকনিকে ঠেলিয়া বহির্গত হইতে চেষ্টা করে, ও ঢাকনি কাঁপিতে থাকে। ভূপৃষ্ঠের অধঃস্থিত জল বাষ্পাকারে পরিণত হইলে, ঐ বাষ্প ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে চেষ্টা করে। ইহাতে ভূপৃষ্ঠে আঘাত লাগে, এবং ভূমিকম্প উৎপন্ন হয়। ভূমিকম্পের এই একটি প্রধান কারণ অনুমান করা যায়—স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ইহা অনুমান মাত্র। জলীয় বাষ্পের তেজে ভূপৃষ্ঠ কোথাও কোথাও বিদারিত হইতে পারে; এবং এইরূপে যে সকল ফাটাফুটা জন্মে, তদ্দ্বারা জলীয় বাষ্পের সঙ্গে সঙ্গে তরল ধাতব-নিস্রবও উৎক্ষিপ্ত হইতে পারে।

"পুরুভুজ" শীর্ষক প্রবন্ধে (৩৭ পৃষ্ঠা) পুরুভুজ, পলা, ও স্পঞ্জ "এক শ্রেণীর অন্তর্ভূত বলিয়া গণ্য" করা হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ শম্বুক এবং পলাতে যত প্রভেদ, পলা এবং স্পঞ্জে প্রায় তত প্রভেদ! আবার স্পঞ্জ বাস্তবিক "জন্তু কি উদ্ভিজ্জ তাহা অদ্যাপি নিরূপিত হয় নাই" লেখা হইয়াছে। নিরূপিত বহুকাল হইয়াছে, অন্ততঃ ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে। স্পঞ্জ যে জন্তু তাহাতে সন্দেহ নাই।

"বৃক্ষ লতাদির উৎপত্তির নিয়ম" সম্বন্ধীয় প্রস্তাবে লেখা হইয়াছে (৪৩ পৃষ্ঠা):—"বীজ-কোষস্থ বীজ সমূহের অঙ্কুরোৎপাদিকাশক্তি সম্পাদন বিষয়ে অনেক পুষ্পে এক প্রকার অতি মনোহর অদ্ভুত কৌশল দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার স্থূল বৃত্তান্ত পশ্চাৎ প্রকাশিত হইতেছে। যে পুষ্পের পরাগ-কেশর বড় আর গর্ভকেশর ছোট তাহা উর্দ্ধমুখ হইয়া থাকে, এবং যে পুষ্পের পরাগ কেশর ছোট গর্ভকেশর বড় তাহা ভুতলের দিকে অধোমুখ হইয়া থাকে। ইহাতে গর্ভকেশরের শিরোভাগ পরাগকেশরের শিরোভাগের অপেক্ষায় নীচে থাকে, সুতরাং পরাগকেশরস্থ রেণু সমুদয় সহজেই গর্ভকেশরে পতিত হইয়া বীজকোষস্থ বীজ সমুদায়ের উৎপাদিকা শক্তি সম্পাদন করে। এতাদৃশ সুচারু কৌশল না থাকিলে পুষ্প হইতে ফল উৎপন্ন হইবার বিলক্ষণ ব্যতিক্রম ঘটিত।"

কতকগুলি উর্দ্ধমুখ ফুলের পরাগকেশর বড় এবং গর্ভকেশর ছোট; এবং কতকগুলি অধোমুখ ফুলের পরাগকেশর ছোট এবং গর্ভকেশর বড়। ইহাদের কোন একটি ফুলের পরাগরেণু যে সেই ফুলটির গর্ভকেশরে পড়িয়া উহার নিষেক

কার্য্য সম্পন্ন করে তাহা অতীব সম্ভব। কিন্তু এই সকল ফুলেও পতঙ্গেরা বসিয়া থাকে, এবং তাহারা এক ফুলের পরাগরেণু লইয়া ভিন্ন ফুলের গর্ভকেশরে স্থাপিত করিয়া শেষোক্ত ফুলের নিষেক কার্য্য সংসাধিত করিতে পারে। বস্তুতঃ প্রকৃতির 'অদ্ভুত' এবং 'সুচারু' কৌশল সাধারণতঃ আত্ম-নিষেক (self fertilisation) বন্ধ করিতে; আত্মনিষেকের পক্ষে নহে। যে সকল পুষ্পে পরাগকেশর এবং গর্ভকেশর উভয়ই বিদ্যমান থাকে, তাহাদের মধ্যেও যাহাতে কোন ফুলের পুষ্পরেণু সেই ফুলের বীজোৎপাদন না করিতে পারে, তজ্জন্য নানাবিধ চমৎকার চমৎকার কৌশল দৃষ্ট হয়।

উপরে যাহা বলা গেল তাহাতে চারুপাঠের ন্যায় উৎকৃষ্ট পুস্তকে কিরূপ দোষ আছে—পাঠক বুঝিতে পারিবেন। অক্ষয় বাবু বিজ্ঞানশিক্ষার যেরূপ উৎসাহী ছিলেন, তাহাতে তিনি জীবিতাবস্থায় বহুদিন ধরিয়া পীড়িত না থাকিলে, সম্ভবতঃ এ সকল দোষ লক্ষিত হইত না। আর একটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। অক্ষয়বাবু বড় ধার্ম্মিক ছিলেন। চারুপাঠের প্রায় প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে তিনি জগদীশ্বরের প্রতি ভক্তি উদ্রেক করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু মধ্যে মধ্যে উহা কতদূর ফলপ্রদ হইবে সন্দেহ। তৃতীয় ভাগ চারুপাঠে "জীব বিষয়ে পরমেশ্বরের কৌশল ও মহিমা।" শীর্ষক প্রস্তাবে, 'বহুরূপ' নামক একটি প্রাণীর বর্ণ পরিবর্ত্তনের উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেছেন—"যিনি সমুদ্র-তটস্থ বালুকা-বিন্দু ও দুর্ব্বাদলস্থ শিশির বিন্দু পর্য্যন্ত কোন বস্তু নিষ্প্রয়োজনে সৃষ্টি করেন নাই, তিনি যে এই অত্যদ্ভুত জন্তুকে, এই অদ্ভুত

শক্তি নিরর্থক দিয়াছেন, অথবা কেবল মনুষ্যের কৌতুক সম্পাদনার্থপ্রদান করিয়াছেন, ইহা কদাচ যুক্তিসিদ্ধ বোধ হয় না। তাহার অবশ্যই কোন নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে তাহার সন্দেহ নাই। মক্ষিকাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ বহুরূপের স্বভাবসিদ্ধ খাদ্য। উহা বৃক্ষ ও গুল্ম আরোহণ ও রসনা প্রসারণ করিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ ও ভক্ষণ করিয়া থাকে; কিন্তু উহার গতি অত্যন্ত মৃদু। পতঙ্গগণ উহাকে নিকটে দেখিলে, অবলীলাক্রমে পলায়ন করিতে পারে। বিশেষতঃ পতঙ্গের দৃষ্টিশক্তি বিলক্ষণ তেজস্বিনী, কোন হিংস্র জীব নিকটস্থ হইলে, তাহারা অনায়াসে দেখিতে পায়। অতএব, কোন প্রকার ছদ্মবেশ গ্রহণ ব্যতিরেকে বহুরূপের অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়া কোন মতেই সম্ভবে না, এই নিমিত্ত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ব-শক্তিমান পরম-পুরুষ তাহাকে ক্ষণে ক্ষণে রূপ-পরিবর্ত্তন-শক্তি প্রদান করিয়া অপার মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন।” কিন্তু বালকদিগের নিকট ইহাতে পরমেশ্বরের মহিমা প্রকাশ হইবে কি না, তাহাতে আমাদের বিশেষ সন্দেহ হয়। আমাদের বিবেচনায় বিপরীত ফল হইতে পারে। ‘বহুরূপ’ ছদ্মবেশে ক্ষুদ্র পতঙ্গদিগকে না ঠকাইয়া আপনার উদরপূর্ত্তি করিতে অক্ষম, তজ্জন্য পরমেশ্বর তাহাকে ছদ্মবেশ দিয়াছেন, ইহা বড় ভয়ানক শিক্ষা! ইহা ধর্ম্মের মূলে, নীতির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে। কথাটা দাঁড়াইতেছে কিসে?—জগদীশ্বর প্রবঞ্চনা করিতেছেন! অথবা তাঁহার একটি জীবকে এরূপ করিয়া গড়িয়াছেন, যাহাতে সে প্রবঞ্চনা না করিয়া জীবন-ধারণ করিতে পারে না, এবং যাহাতে সে অক্লেশে প্রবঞ্চনা করিতে

পারে। সে যে প্রবঞ্চনা করে তাহাই তাঁহার উদ্দেশ্য! এখানে যে কায 'সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, পরমপুরুষের' উপর আরোপিত হইয়াছে, তাহা কোন মানুষে করিলে তাহাকে আমরা ঘৃণা করিব না কি? মনে কর, কোন ব্যক্তি দেখিল যে কতকগুলি লোক প্রয়োজনানুযায়ী খাদ্য পাইতেছে না। সে ইহাদিগকে এরূপ চাতুরী শিখাইল যাহাতে ইহারা ধরা না পড়িয়া, অন্যান্য লোককে ঠকাইয়া, বা অন্য লোকের বাড়ীতে চুরি করিয়া বিলক্ষণ দু পয়সা উপার্জ্জন করিতে এবং উদর ভরিয়া খাইতে পারে। ঐ ব্যক্তির কি আমরা বুদ্ধির এবং শক্তির তারিপ করিব? না উহাকে একবাক্যে ধিক্কার দিব? এ সকল প্রশ্ন কি ছাত্রদিগের মনে উদয় হইতে পারে না? আবার, 'বহুরূপ' যেরূপ ঈশ্বরের জীব, ক্ষুদ্র পতঙ্গও সেইরূপ ঈশ্বরের জীব। ন্যায়বান্ ঈশ্বর বহুরূপের এত পক্ষপাতী কেন হইবেন? ক্ষুদ্র বলিয়া বেচারি পতঙ্গ কি তাঁহার দয়ার পাত্র নহে?

আজকাল নানারকমের সভা সমিতি হইতেছে—সুচিহ্ন। বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি-সাধনের জন্য একটি সভা হইলে ভাল হয় না কি? এরূপ সভার সভ্যগণ অন্যান্য কার্য্যের মধ্যে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহাদের মধ্যে একটি সবকমিটি ইতিহাসের ভার লইবেন; একটি সব-কমিটি বিজ্ঞানের ভার লইবেন; এইরূপ কতকগুলি সব-কমিটিতে সভার কার্য্য বিলি করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের ন্যায় দেশে পুস্তক প্রকাশের কার্য্য পুস্তক বিক্রেতারাই করিয়া থাকে। ম্যাকমিলান, লংম্যান প্রভৃতি পুস্তক বিক্রেতারা

ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করিয়া থাকে। এখানে সেরূপ পুস্তক প্রকাশক নাই। এখানে বালকদিগের পাঠ্য পুস্তকের প্রচলন অনেকটা—প্রায় সম্পূর্ণ-রূপে—ইনস্পেক্টর মহাশয়দিগের হাতে। ইঁহাদিগেরদ্বারা—অজানতই হউক, আর যাহাই হউক—ব্যক্তি বিশেষের উপর যেরূপ অন্যায়াচরণ সম্ভব, একটি সভার উপর সেরূপ সম্ভবে না; বিশেষতঃ যদি সভাটি ক্ষমতাশালী হয়। পুস্তক নির্ব্বাচনের জন্য এখন কলিকাতায় টেক্সট্‌বুক কমিটি নামে একটি কমিটি আছে। ইহার ভিতর অনেক মান্য গণ্য পণ্ডিত লোক আছেন। কিন্তু, প্রথমতঃ, ইঁহারা সব বিষয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, ইঁহারা পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন মাত্র, নূতন নূতন পুস্তক প্রকাশ করেন না।

উল্লিখিত সভাস্থাপনের প্রস্তাবটি বোধ হয় নূতন নহে। এখনও যে শীঘ্র কার্য্যে পরিণত হইবে, তাহার আশা করা যায় না; কিন্তু যতদিন না হইবে, ততদিন বাঙ্গালা ভাষার এবং বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইবে না।

কেঁচো।

১। মুখবন্ধ।

কেঁচো সংস্কৃত 'কিঞ্চিলিক' বা 'কিঞ্চলুক' শব্দের অপভ্রংশ; যে কিং অর্থাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ চলে। ইহার অপর নাম 'মহীলতা।' এই তিনটীর কোন একটী নাম দিলে অনেকের

কাছে কেঁচো সম্ভবতঃ মান সম্ভ্রম পাইত, অন্ততঃ তত হেয় বলিয়া বোধ হইত না। 'কিঞ্চিলিক,' 'কিঞ্চুলুক,' বা 'মহীলতা' অনেকের কাণে শুনিতেও ভাল লাগিবে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার কাণে চির পরিচিত কেঁচো নামটাই ভাল শুনায়; অন্য কোন নামে ইহাকে ডাকিতে কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকে, লিখিতে কলম সরে না। পাঠক বলিতে পারেন, আমার রুচির দোষ। বলেন, বলুন। বাল্যকালাবধি যে নামটী শুনিয়া আসিয়াছি, ব্যবহার করিয়াছি, তাহা আমার বড় প্রিয়, ছাড়িতে মায়া হয়। কেঁচোকে যে একটী বড় নাম দিয়া ডাকিলেই তাহার গৌরব বাস্তবিক বাড়িবে, আমার এরূপ বিশ্বাসও নয়। তাহার কার্য্য মহত্বই তাহার গৌরব। নামে কি করে?

আমরা মাছ ধরিবার জন্য কত কেঁচো খুঁড়িয়া তুলি, টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া বঁড়শীতে বিঁধি। কেঁচো মাছের উৎকৃষ্ট টোপ। গর্ব্বিত মানুষ মনে করে, "পরমেশ্বর আমাদের আহারের জন্য জলে মাছ সৃষ্ট করিয়াছেন; তাহাকে ধরিবার জন্য ভূমিতে কেঁচো দিয়াছেন; আহা কি অপূর্ব্ব কৌশল!" মাছ ধরা ব্যতীত প্রকৃতির রাজ্যে কেঁচোর অন্য কোন কাজ আছে কি না, ক জন তাহার অনুসন্ধান করে? তাহার প্রাণ আছে সে টুক বুঝিতে পারি, কারণ তাহাকে তুলিবার সময়, হিলবিল্ করিয়া নড়ে। কিন্তু কেঁচো নিকৃষ্ট প্রাণী; অনেকে তাহাকে ছুইতে ঘৃণা বোধ করেন; সে কি বড় কাজ করিতে পারে? তাহার বিষয় আমরা কি লিখিব? তাহার ইতিহাসে আমরা কি শিখিব?

কেঁচো প্রকৃতির কৃষক—যখন মনুষ্য জন্মে নাই, তখন জমি চসিয়া দিত; আর এখনও বন জঙ্গলে, যেখানে মানুষের লাঙ্গল চলে না, সেখানকার জমি চসিয়া দেয়। কেবল তা নয়; এই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ কীট জমির একজন প্রধান সৃষ্টিকারক, এবং উর্ব্বরতাসাধক। আবার আমাদের যে অমিশ্র উপকার করে তা নয়, অনেক হানিও করিয়া থাকে। তাহার উৎপাতে বাড়ীর রক বসিয়া যাইতে দেখা যায়; অগভীর ভিত্তি কমজোর হইয়া কালে নিম্নগামী হয়; প্রাচীন, পতিত গৃহের মেজে তাহার পরিত্যক্ত মৃত্তিকাবৃত হয়। কেঁচোর এসব কাজ কি রূপে সাধিত হয় বুঝিবার আগে, তাহার শরীরতত্ত্ব অনুসন্ধান করা যাউক। তার জন্য যতটুকু সময় ও মনোযোগ দরকার, পাঠক, তুমি তাহা দিতে কি কুণ্ঠিত? নিকৃষ্ট জীবের পর্য্যালোচনায় আমরা কত মহৎ সত্য শিখি! মানুষাদি উচ্চ জীবকে বুঝিবার একমাত্র উপায় কীটাদি নীচ জীবের আলোচনা করা। সংসারে ছোট বড় যত প্রাণী আছে সকলেই আমাদের আলোচ্য, বিজ্ঞানের চোখে সকলেই সমান। জীবের ক্রমোন্নতি প্রাণীবিদ্যার একটী দৃঢ় মূলীভূত সত্য। ইহা কি চমৎকার!

২। বাসস্থান।

কেঁচো ভিজে স্যাঁৎসেতে জায়গায় থাকিতে ভাল বাসে। বর্ষাকালে ইহাকে জমির অল্পনীচেই পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার বিবর কখনও কখনও ২। ৩ হাত গভীর হইয়া থাকে। বাসস্থান খুঁড়িবার সময় কেঁচো কতক মাটি ঠেলিয়া ফেলে,

কতক উদরস্থ করে, এবং পায়ু দ্বারা মৃত্তিকা নির্গত হইতে থাকে। আমি একটি টবে মাটি পুরিয়া গুটীকত কেঁচো ছাড়িয়া দিলাম, ৩। ৪ মিনিটের মধ্যেই তাহারা বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া নীচে চলিয়া গেলে। কিন্তু ঐ মাটি খুব চাপিয়া, শক্ত করিয়া একটীকে রাখিলাম; সে তাহা খুঁড়িতে একেবারেই যেন অক্ষম, মনে হইল, এদিক ওদিক নরম মাটি খুজিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আর একটীকে তাহার সাহায্যার্থে দিলাম তখন দুইজনে গায় গায় জড়াইয়া একত্রে, একস্থানে মুখ বাড়াইয়া খুদিতে লাগিল—একজন একটু, আর একজন আর একটু, এইরূপ একটু একটু করিয়া পন ঘণ্টার মধ্যে তাহারা অন্তর্হিত হইল। কেঁচোর বিবর সোজা নয়, বক্রাকৃতি; কখনও কখনও তাহার মুখ পাতা ইট পাট্‌কেলের টুকরা ইত্যাদি দ্বারা বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে শত্রু না আসিতে পারে। তাহার বল্মীক পায়ু পরিত্যক্ত মল মাত্র। একজাতীয় কেঁচোর (যাহাকে ঘাসাচ্ছাদিত মাঠ ময়দানে সচরাচর পাওয়া যায়) বল্মীক, স্তম্ভের ন্যায়। এই স্তম্ভ এক ইঞ্চ দুই ইঞ্চ, বা ততোধিক উচ্চ হইতে পারে। আর এক-জাতীয় কেঁচো আছে তাহার ঢিবি ছোট ছোট, পৃথক্ পৃথক্, গুটীর রাশিমাত্র। জলের মধ্যে কেঁচো অধিকক্ষণ বাঁচিতে পারে না, আমি কতকগুলিকে বিকালে একটি জলপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া, তার পরদিন সকালে দেখিলাম তাহারা মৃতবৎ; পরে ২। ৩ ঘণ্টার মধ্যে মরিয়া গেল। তজ্জন্যই বোধ হয় বর্ষার পর অনেক মরা কেঁচো দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। খাদ্য, পাক-প্রণালী।

কেঁচো রাত্রিকালে আহারান্বেষণে বাহির হয়। দিনের বেলা অনেক শত্রু, পাখী, পিঁপড়া ইত্যাদি। অতএব তখন প্রায়ই লুকাইয়া থাকে। কেবল নিষেক (fertilisation) কার্য্যের সময় মধ্যে মধ্যে ইচ্ছামত বাহির হইতে দেখা গিয়াছে। কেঁচোর প্রধান খাদ্য মৃত্তিকা এবং পাতা, কিন্তু অন্যান্য বহুতর জিনিস খাইয়া থাকে, এমন কি চর্ব্বি, মাংস পর্য্যন্তও ছাড়ে না। খাইবার সময় মুখ এবং তাহার নিম্নস্থিত স্ফীত গলদেশ ১ (pharynx) বাহির করে। কেঁচোর দাঁত নাই; তাহার খাওয়া চিবান নয়, এক রকম চোষা। আমি উপরে যে টবের কথা বলিয়াছি, তাহাতে কতকগুলি শুষ্ক পেয়ারার পাতা রাখিয়াছিলাম; তাহার শিরগুলি ছাড়িয়া ছাল চুসিয়া লইয়াছে, এবং পাতা একটি জালের আকার ধারণ করিয়াছে। তাহার পরিত্যক্ত মাটি কিম্বা তাহার অন্ত্রাণি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে উহার ভিতর অনেক অতি ক্ষুদ্র

---

১ ইহা দেখিবার জন্য একটী মোটাগোছের কেঁচো লইয়া তাহাকে ক্লোরাফর্ম দ্বারা বা স্পিরিটে ডুবাইয়া মারিয়া ফেল। পরে তাহার পৃষ্ঠভাগে (যে ভাগ অপেক্ষাকৃত কাল), মাঝামাঝি, মুখ হইতে গাত্রের চর্ম্ম খুব ছোট ধারাল কাঁচির দ্বারা সতর্কতার সহিত ব্যবচ্ছেদ কর। পরে pie dish এর ন্যায় পাত্রে জলের নীচে কর্কে বা কোন নরম কাষ্ঠখণ্ডে ব্যবচ্ছিন্ন চর্ম্ম দুই পাশে আলপিন্ দ্বারা বিদ্ধ কর। উপরে পাক প্রণালী, এবং তাহার নীচে শাদা সূতার ন্যায় স্নায়ু প্রণালী দেখিতে পাইবে। কর্ককে জলে ডুবাইবার জন্য তাহার নিম্নভাগে সিসা কি অন্য কোন ভারি পদার্থের পত্তর মারিতে, কিম্বা কর্কের নিম্নভাগ ও পার্শ্বচতুষ্টয় রাং দ্বারা মোড়াইতে হয়।

ইষ্টকখণ্ড দৃষ্ট হইবে। এ সব নিশ্চয়ই সে খাইয়াছিল। কিন্তু কি জন্য? মাটি বা পাতাতে শরীরপুষ্টিকারক জীবজ পদার্থ (organic substance) বেশ আছে, কিন্তু ইটে নাই। তবে ইচ্ছা করিয়া এত ইটের টুকরা খাইয়া থাকে কেন?

এস্থলে কেঁচোর পাকযন্ত্র সম্বন্ধে দু চার কথা বলা আবশ্যক। ইহার গঠন কৌশল অতি চমৎকার।

'গল' শব্দ গল্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'গল্' ভোজন করা। যে রাস্তা দিয়া ভুক্তবস্তু মুখ হইতে জঠরে যায়, তাহার মুখের দিকের অংশকে গলদেশ বলা হইল। গলদেশের নিম্নে গলনালী।

চিত্রে প্রথমতঃ মুখ, মুখের নীচে পূর্ব্বোল্লেখিত অত্যন্ত স্ফীত গলদেশ তার নীচে লম্বা গলনালী। গলনালীর নিম্নভাগ স্ফীত। এই



স্ফীতাংশের আবরণ অত্যল্প স্থূল ও কঠিন, ইহাকে ইংরাজীতে ক্রপ বলে। ইহার নীচে জঠর, পরে অত্যন্ত লম্বা অন্ত্রাণি। ক্রপের সহিত সংশ্লিষ্ট কতিপয় সাতিশয় বলবান্ মাংশপেশী আছে। আহারের সময় এই সকল মাংশপেশী সজোরে চালিত হয়, এবং ক্রপের ভিতর ইষ্টক খণ্ড সমূহের সাহায্যে পত্রাদি খাদ্য চূর্ণীকৃত হয়। কেঁচোর দাঁত নাই পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ইটের টুকরা দাঁতের কাজ করে।

৩। স্নায়ুপ্রণালী, ইন্দ্রিয়, মানসিক বৃত্তি, ইত্যাদি।

কেঁচোর স্নায়ুপ্রণালী সূত্রের ন্যায়, মধ্যে মধ্যে স্থূলাংশ, আমাদের মত পাকপ্রণালীর উপরিভাগে নয়—নিম্নভাগে। কিন্তু ইহার সহিত সংযুক্ত, গলদেশের উপর, একটী বিশেষ স্থূলাংশ (ganglion) দেখিতে পাওয়া যায়। কেঁচোর চোখ নাই। গাত্র দ্বারা আলোক প্রবিষ্ট হইয়া এই স্থূলাংশতে লাগে, তাহাতেই সে আলোক অন্ধকার বুঝিতে পারে, রাত্রি দিন চিনিতে পারে, দিনের বেলায় শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা পায়। যদি তাহার অগ্রভাগ ঢাকিয়া, কেবল পশ্চাদ্ভাগ আলোকিত করা যায়, তাহা হইলে আলোকরশ্মি গলার উপরস্থিত স্নায়ুবাংশে প্রবেশ করিতে পারে না, কাজে কাজেই সে অবস্থায় কেঁচোরও আলোক বোধ জন্মে না। তাহার কাণ নাই। ঢাক ঢোল বাজাও শুনিতে পাইবে না, নির্ভয়ে চরিবে। কিন্তু যে পাত্রে সে থাকে তাহা যদি কোন মতে স্বল্প পরিমাণেও চালিত হয়, তাহা হইলে ভয় পায়, এবং দ্রুতগতি বিবরে প্রবেশ করে। এস্থলেও শব্দ-হিল্লোল, সম্ভবতঃ যে স্নায়ুর কথা এই মাত্র বলা হইল তাহা দ্বারা কাজ করে। কেঁচোর স্পর্শ শক্তি খুব প্রবল। বিবর হইতে বাহির হইবার সময় মুখ বাড়াইয়া স্পর্শ করিয়া চারিদিকের খবর লয়। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে আমার টবস্থিত একটী কেঁচো বিবর খুঁড়িবার সময় শরীরের অগ্রভাগ দ্বারা স্পর্শ করিয়া কিরূপে নরম মাটি খুঁজিতে লাগিল। কেঁচোর আস্বাদনেন্দ্রিয় বেশ আছে,

খাদ্যদ্রব্যের তারতম্যবোধ বিলক্ষণ প্রদর্শন করে। প্রাণী-তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতেরা দেখিয়াছেন, সে কোন কোন গাছের পাতা খুব ভাল বাসে, কোন কোন গাছের পাতা আদৌ স্পর্শ করে না। তাহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় তত প্রবল নয়; চোনা, হুকার জল প্রভৃতি দুর্গন্ধময় পদার্থ তাহার বাসস্থানের উপর ঢালিয়া দিলে শুনিয়াছি সে বাহির হয়; কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যের গন্ধের দরুণ কি তন্মিশ্রিত হানিজনক পদার্থের দরুণ এরূপ ব্যবহার করে, তাহার মীমাংসা আবশ্যক।

পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে কিরূপে দুইটী কেঁচো গায় গায় জড়া-জড়ি করিয়া একত্রে কঠিন মাটি খুঁড়িয়া বাসস্থান নির্ম্মাণ করিল। এই কাজে কি তার বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায় না? পাঠক, তুমি হয়ত বলিবে, "কেঁচো আবার জন্তু, তার আবার বুদ্ধি!" বাসস্থান নির্ম্মাণ করা, রাত্রিতে চরা, দিনে লুকাইয়া থাকা, এ সব অভ্যস্ত কাজ, ছোট বড় সব কেঁচোই করিয়া থাকে, তাহাতে বুদ্ধির দরকার নাই। কিন্তু আমি যে স্থান হইতে উপরোক্ত কেঁচোদ্বয়কে লইয়াছিলাম, সেখানকার জমি খুব নরম; দুই জনে মিলিয়া যে শক্ত মাটি অপেক্ষাকৃত সহজে খনন করিতে পারিবে, তাহা তাহাদের অভ্যাস হইবার কোন সুবিধা ছিল না, তবু যে তাহারা একত্রে কাজ করিতে আরম্ভ করিল, তাহা কতকটা বুদ্ধির পরিচয় নয় ত আর কি বলিব? প্রাণীতত্ত্ববিৎ মহাপণ্ডিত মৃত ডারউইন কেঁচো কেমন বুদ্ধি খাটাইয়া, যে পাতার যে দিক ধরিয়া লইয়া গেলে তাহার বিবরের মুখ উৎকৃষ্টরূপে বন্ধ হইবে, ঠিক সেই দিক ধরিয়া টানিয়া লইয়া যায়, দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

আমরা যখন বিশেষ মনোনিবেশ করিয়া কোন বিষয় ভাবি, তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হই। কেঁচোরও সেইরূপ ঘটিয়া থাকে; সে যখন চরে বা অন্য কোন কাজে ব্যাপৃত থাকে, তখন আলোক-রশ্মি বা শব্দহিল্লোল তাহাকে তত উত্তেজিত করিতে পারে না। মন না থাকিলে মনোনিবেশ করা হয় না; অতএব কেঁচোরও মন আছে, এরূপ সাব্যস্ত করা যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না।

কেঁচোর শরীর বহুসংখ্যক ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে যাতায়াতের সুবিধার জন্য কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র কাঁটা থাকে এত ক্ষুদ্র যে অনুবীক্ষণের সাহায্যব্যতীত সুচারুরূপে দেখা যায় না, কিন্তু আঙ্গুল চালাইলে তাহাতে বাধে, খর্ খর্ করে। চলিবার সময় কেঁচোর পৃষ্ঠভাগে রক্তবৎ পদার্থে পরিপূর্ণ, সঙ্কোচশীল একটী লম্বা নল দেখা যায়। ইহার গঠন ও কার্য্য অত্যন্ত জটিল এখানে তাহার বর্ণনা করিব না। এই মাত্র বলিয়া রাখি, উহাতে রক্তের ন্যায় যে পদার্থ দৃষ্ট হয়, এবং কেঁচোকে কাটিলে যাহা নির্গত হয়, তাহা রক্ত নয়। যে জলীয় পদার্থ কেঁচোর বাস্তবিক রক্তের কাজ করে তাহা শাদা, রক্তের মত আদৌ দেখিতে নয়। কেঁচোর নিকট সম্বন্ধীয় জল-বাসী অনেক কীটের শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য কানকা (Gills) আছে; তাহার নিজের সেরূপ কোন যন্ত্র নাই। তাহার শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য ছিদ্র বহুল গাত্র দ্বারা সমাধা হয়।

কেঁচোর পুরুষ এবং নারী অঙ্গ দুই একত্রে প্রত্যেকে বিদ্যমান। কিন্তু তাহাদের পরস্পর সংযোগে নিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। প্রত্যেক কেঁচোর দেহাভ্যন্তরস্থিত পুরুষ ও নারীর

সম্বন্ধ ভ্রাতা ভগ্নীর ন্যায়; তাহাদের বিবাহ, ভিন্ন কেঁচোর নারী ও পুরুষের সহিত হইয়া থাকে। এই জন্য দুইটী কেঁচো পরস্পর সম্মিলিত না হইলে তাহাদের বংশ বৃদ্ধি হয় না।

৫। কৃষিকার্য্য।

কেঁচো আপন বাসস্থানের জন্য বিবর খুঁড়িয়া, মাটি উল্‌টিয়া পাল্‌টিয়া দিয়া বৃষ্টি ধারার প্রবেশের ও চালনার সুবিধা করিয়া দেয়। যেখানে তাহারা অনেকে থাকে সেখানে এইরূপ শত শত বিবর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বিবরের দরুণ জমি নিঃসন্দেহ অনেকটা সিক্ত থাকে, এবং কৃষিকার্য্যের সুবিধা হয়। কেঁচো ইট পাট্‌কেলের ন্যায় বহুতর বীজ ভক্ষণ করিয়া থাকে। ঐ বীজ পরিত্যক্তমলের সহিত বহির্গত হয়; তাহার উৎপাদিকা শক্তি কখনও কখনও অনেক দিন পর্য্যন্ত বেশ বজায় থাকে, কালে উহা অঙ্কুরিত হয়।

কেঁচো জমি প্রস্তুত করিতে, এবং তাহাকে সারবান্ করিতে বড় পটু। কোন স্থলে ইটপাট্‌কেল কাঁকরাদি ছড়াইয়া রাখিলে, সে নিম্নস্থ মাটি উঠাইয়া ক্রমশঃ উহাকে আবৃত করে। এই উত্তোলিত মৃত্তিকা অল্প অল্প করিয়া বৃদ্ধি পায়; কালে ইহা দ্বারা উর্ব্বর শস্যোৎপাদক জমি তৈয়ার হইতে পারে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কেঁচো কিরূপে এবং কি জন্য জমির সহিত মিশ্রিত ছোট ছোট ইষ্টক খণ্ডাদি উদরস্থ করে। গাছপালার শিকড়ের নিকট হইতে এই সকল হানিজনক জিনিস এক একটী করিয়া বাহিরে সরাইয়া সে নিশ্চয়ই তাহাদের বৃদ্ধির বিশেষ আনুকূল্য করে। বিবরের মুখ বুজাইবার

জন্য যে সকল পাতা জমির নীচে লইয়া যায় তাহা কালে পচিয়া উহার সহিত মিশ্রিত হয়। আবার, পাতা কেঁচোর একটী প্রধান খাদ্য। উদরস্থ পাতার টুকরা সকল হইতে শরীরের পোষণোপযোগী পদার্থ গৃহীত হইলে, অবশিষ্টাংশ মলের সহিত নির্গত হয়, ক্রমে মাটির সহিত মিশিয়া যায়, এবং তাহার উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করে। একটী টবে একজন কেঁচোতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিত বালি পূরিয়া তাহাতে পাতা ও কতকগুলি কেঁচো রাখিয়াছিলেন, দিনকতকের মধ্যেই ঐ বালি উত্তম সারজমি হইয়া দাঁড়াইল।

৬। রক্ষাকার্য্য।

ইটপাটকেলাদির ন্যায় অন্যান্য অনেক জিনিস কেঁচোর মাটিতে আবৃত হইতে পারে। এইরূপে বহুতর প্রাচীন পদার্থ যাহা এককালে জমির উপর পড়িয়াছিল, কেঁচোর দৌলতে জমির নীচে সুচারুরূপে রক্ষিত হইয়াছে। প্রাচীন অট্টালিকা মন্দির প্রভৃতির ভগ্নাবশিষ্ট অংশাদি তাহাদের নীচে হইতে মাটি তোলার জন্য দমিয়া যায়, এবং ঐ স্তূপীকৃত কীটোত্তোলিত মৃত্তিকা দ্বারা আবৃত হইয়া সংরক্ষিত হয়। এজন্য পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের কাছে কেঁচো অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

৭। ক্ষয়কার্য্য।

পৃথিবীর উপরিভাগ (ভূপৃষ্ঠ) বাতাস, বৃষ্টি, বরফ প্রভৃতির কার্য্যে বৎসরের পর বৎসর একটু একটু করিয়া ক্ষয় পাইতেছে। কেঁচো এই ক্ষয়কার্য্যের সহায়তা করে। তাহার বিবর দ্বারা বৃষ্টির জল প্রবেশ করিয়া কেবল যে জমির উপকার করে তাহা নয়, অপকারও করিয়া থাকে—জমি কমজোর হইয়া ধসিতে

পারে; ধসিলে তাহাকে ধুইয়া লইয়া যাইবার বিশেষ সুবিধা হয়। কেঁচোর ভক্ষিত মাটি, ইটপাটকেল, কঙ্করাদি অনেকটা তাহার বিবরের মুখে জমির উপর পরিত্যক্ত হয়। উহা, বিশেষতঃ, বেলে জমির কীটের গুটির ন্যায় মল, বর্ষাকালে সহজে ধৌত হইয়া যায়, এবং বৃষ্টির জল মিশ্রিত নলির বৃদ্ধি সাধন করে। পাঠকের বোধ হয় জানা আছে, যে ঐ নলি নালা, খাল দ্বারা নদীতে বাহিত হয়।

গোঁড় গীত।

উত্তরে নর্ম্মদা হইতে দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত গোঁড়দেশ বিস্তৃত। হোসঙ্গাবাদ, জব্বলপুর, মাণ্ডলা, রাইপুর প্রভৃতি মধ্য প্রদেশের প্রায় সমুদয় জেলাতেই গোঁড়ের বসতি দেখিতে পাওয়া যায়। নাগপুরের প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টানধর্ম্ম প্রচারক হিস্‌লপ গোঁড়দের কতকগুলি গীত সংগ্রহ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর, ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দে তৎকালীন মধ্যপ্রদেশের প্রধান কমিসনর, রিচার্ড টেম্পল (এক্ষণে সার রিচার্ড টেম্পল) ঐ সকল গীত ইংরাজী অনুবাদ সহ প্রকাশ করেন। নিম্নে ইহার (অনেক বাদ সাদ্ দিয়া) বাঙ্গালা অনুবাদ করা গেল; স্থানে স্থানে কেবল ভাবার্থ লওয়া হইয়াছে। গীতগুলি গোঁড় সমাজের ক্রমবিকাশ অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশ করে, তজ্জন্য বিশেষ মনোযোগের সহিত পঠিতব্য। কিন্তু তা ছাড়া উহাতে মধ্যে মধ্যে বেশ কবিত্ব লক্ষিত হয়। গীত কয়টীর বর্ত্তমান পরিচ্ছদে হিন্দুদের হাত দেখা যায়। কিন্তু গীতগুলির আসল গঠন যে গোঁড়ী তা স্পষ্ট বুঝা যায়।

প্রথম ভাগ।

গোঁড়ের কারাবাস।

জনমিয়া গোঁড় বনে ছড়ায়ে পড়িল,
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ কিম্বা নিম্ন উপত্যকা,
গোঁড় নাই হেন ঠাঁই দেখা নাহি যায়।
যাকিছু দেখিতে পায় তাই খাদ্য তার;
হরিণ, শৃগাল, ভেক, মহিষ, শূকর,
ষাঁড়, গরু, আরসোলা, কিম্বা গিরগিটা
নাহি কোন মানবিচ সব ধরে খায়। *
ছয় মাস ধরে গোঁড় স্নান নাহি করে;
মুখ নাহি ধোয় কভু; গোবরের পর
স্বচ্ছন্দে শুইয়া রহে; † ছিল এইরূপ
গোঁড় সৃষ্টির প্রথমে; পূরিল অনিল
দুর্গন্ধে ধবলগিরি শিবের আবাস।
ক্রোধান্ধ ধূর্জ্জটী বলে ডাকি নারায়ণে;—
"কলুষিত সব স্থান করিলেক গোঁড়;
ধ্বংসিব তাহার বংশ প্রতিজ্ঞা আমার।
এহেন ধবলগিরি, বাসস্থান মোর,
পূরিত দুর্গন্ধে এবে; আন হেথা গোঁড়"।

---

* জঙ্গলের গোঁড়েরা অদ্যাপি এরূপ খাইয়া থাকে।

† নিতান্ত অসভ্য গোঁড়ের পক্ষে এ চিত্রটী এখনও অযথার্থ নহে।

দলে দলে গোঁড় তবে হইল আনীত ;
লয়ে তাহাদিগে নিয়ে, উপত্যকা মাঝে,
সারি সারি করি শিব বসায়ে সবারে,
নিরমিয়া এক কাঠবিড়ালি তখন,
জীবিত করিয়া তারে দিলেন ছাড়িয়া।
খাড়া করি লেজ কাটবিড়ালি দৌড়ায় ;
দেখি তারে গোঁড় সব উঠিল দাঁড়ায়ে,
ধায় পিছে পিছে তার, কেহ বলে "মার,"
কেহ বলে "ধর, খেতে বড় মজা হবে।"
আহরিল যষ্টি কেহ, কেহ বা পাথর;
দৌড়ে দ্রুতবেগে সবে ; লম্বা লম্বা চুল
উড়িল আকাশে। * ছিল কারাগার এক
শিবের, প্রবেশে কাটবিড়ালি তথায় ;
প্রবেশি তাহার সনে যত গোঁড় দল,
চারি জন ছাড়া সবে বন্দী হলো তথা।
প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড কারাগার মুখে
স্থাপিলেন শিব ; ভস্মা সুর নামে দৈত্য
প্রহরীর কার্য্যে তথা হলো নিয়োজিত।
হেন কালে নিদ্রাহতে উঠিয়া পার্ব্বতী
ভাবিলেন "কতদিন হলো আমি দেখি
নাই গোঁড়, কোথা গেল, হায়, তারা সবে ?
আছিল ধবলাগিরি কোলাহলপূর্ণ,

---

* শীকারে গোঁড়দের উৎসাহ এখানে বেশ প্রদর্শিত হইয়াছে।

স্তব্ধ চারিদিক আজ ; নাহি সাড়া শব্দ।"
বলিলেন মহাদেবে, "গোঁড় মোর নাহি
আসে, কোথা গেল তারা ? বল শূলপাণি।"
"অসহ্য দুর্গন্ধে পূর্ণ হলো মম গিরি,
বন্দী তাই তাহাদিগে করিয়াছি, কিন্তু
পলায়েছে চারিজন," উত্তরিল শিব।
অই চারি গোঁড় ঘুরি জঙ্গলে জঙ্গলে
উত্তরিল "কাচিকোপালাহুগড়" স্থানে।
সন্ধান তাদের নাহি পাইয়া পার্ব্বতী,
আরম্ভিল তপ গোঁড় তারিবার তরে।
অন্তর্যামী ভগবান জানিলেন সব,
বলিলেন নারায়ণে "বল পার্ব্বতীরে,
রক্ষিবারে গোঁড় আমি করিব উপায়।"

দ্বিতীয় ভাগ।

লিঙ্গোর জন্ম ও মৃত্যু।

*   *   *   *

উদ্ধারিতে গোঁড়ে তবে দেব ভগবান
লিঙ্গোকে দিলেন জন্ম। পঁহুছিল লিঙ্গো
যথায় পলায়েছিল গোঁড় চারিজন।
এনেছিল জন্তু যাহা শীকার করিয়া,
খেতেছিল তারা তাহা কাঁচা কিম্বা সিদ্ধ।
নিরখি লিঙ্গোকেতারা বলিতে লাগিল,—

"আছি মোরা চারি ভাই, পাইব পঞ্চম,
ডাকিয়া আনিব মোরা উহাকে হেথায়।"

* * * *

শিখাইল লিঙ্গো চাস গোঁড় চারিজনে।
কাটি গাছ পালা, মাঠ করি পরিষ্কার
বেড়িল তাহায়, রাখি দ্বার একদিকে;
রোপিলেক ধান্য তবে লিঙ্গো সেইখানে।
দেখিয়া লিঙ্গোর কীর্ত্তি অবাক তাহারা! *
একদা রাত্রিতে তারা বহু চেষ্টা করি
চকমকি হতে নারে আগুন করিতে।
বলিলেন তবে লিঙ্গো গোঁড় চারিজনে,
"তিন ক্রোশ দূরে থাকে রিকাদ রাক্ষস,
আছে অগ্নি মাঠে তার, আন সেথা হতে।

---

* গোঁড়েরা অন্যান্য জাতির ন্যায় প্রথমাবস্থায় কেবল শীকার করিয়া প্রাণধারণ করিত, পরে চাস শিখে; এই সঙ্গীত দ্বারা তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সে চাস ও আমাদের দেশের চাসের ন্যায় নহে। তাহাতে লাঙ্গলের প্রয়োজন নাই, বলদ বা মহিষের প্রয়োজন নাই। অল্প ঢালু স্থানে জঙ্গল কাটিয়া মাঠ প্রস্তুত করে; সেখানে কর্ত্তিত বৃক্ষ গুল্মাদি জ্বালাইয়া দেয়, মাঠ ছাই দ্বারা আবৃত হয়; পরে উহার উচ্চতম স্থানে বর্ষার প্রারম্ভে বীজ বপন করে। ঐ বীজ বৃষ্টির জলে মাঠময় ছড়াইয়া পড়ে। এইরূপে শস্যোৎপন্ন হয়। এই রকমের চাসকে "ডাহি" বলে। জঙ্গলের গোঁড় এবং অন্যান্য অনেক অসভ্য জাতি অদ্যাপি "ডাহি" করিয়া থাকে। তাহাতে খরচ নাই বলিলেও হয়।

দেখি ধূম দূর হতে চিনিবে সে স্থান।"
এ বলে উহারে "আমি যাব না সেথায়,"
বয়সে সবার ছোট ছিল যেই জন,
সেই তবে অবশেষে চলিল সেখানে।
জ্বলিছে তথায় অগ্নি উচ্চে ধূ ধূ করে;
বড় বড় শাল, আর, মহুয়া, আগুন,
মোটা মোটা গুঁড়ি তার জ্বলিছে প্রবল।
পাইয়া তাহার তাপ, হৃদয়ের সুখে
গভীর নিদ্রায় মগ্ন রিকদ রাক্ষস। *
ভয়ে জড়সড় গোঁড় কাঁপে থর থর;
ভাবিতে লাগিল "পড়ি যদি রাক্ষসের
চোখে, নাহিক নিস্তার, নিশ্চয় মরণ।"
চুপি চুপি গিয়া তবে আগুনের কাছে
উঠাইল গুঁড়ী এক—পড়িল স্ফুলিঙ্গ
বৃদ্ধ রাক্ষসের পায়, দহিল সে স্থান।
তাড়াতাড়ি ঝাড়া দিয়া উঠিল রাক্ষস
বলিলেক "গোঁড় ক্ষুধা লাগিয়াছে মোর,
কচি সশা মত তুই এসেছিস হেথা।"
ঊর্দ্ধশ্বাসে গোঁড় তবে যায় পলাইয়া,
ফেলিয়া পশ্চাতে গুঁড়ি লয়েছিল যাহা,
নাহি থামে, নাহি চায় পিছে একবার;

* গোঁড় প্রভৃতি জাতিরা এইরূপ আগুন জ্বালাইয়া তাহার পাশে শুইয়া মাঠ চৌকি দেয়।

অবশেষে প্রাণে প্রাণে আসিয়া স্ববাসে,
বলিতে লাগিল সবে হাঁপাতে হাঁপাতে,
"গিয়াছিনু অগ্নিতরে, দেখিনু প্রকাণ্ড
এক রাক্ষস তথায়, পলাইয়া তবে
কোনমতে বেঁচে ফিরে এসেছি হেথায়।" *
এত শুনি লিঙ্গো নিজে চলিল তথায় ;
লইয়া কুমড়াখোলা, বংশখণ্ড আর,
ছিঁড়ি কেশ শির হতে, সারঙ্গের ন্যায়
বাদ্য যন্ত্র এক লিঙ্গো করি নিরমাণ,
ধনুক প্রস্তুতি তবে, বাজাইল তায়।
বড় খুসি মনে লিঙ্গো, করে করি তাহা
রাক্ষসের ক্ষেত্রে আসি হলো উপনীত।
লম্বিত রিকদ তথা আগুনের পাশে
প্রকাণ্ড শুঁড়ির ন্যায়, বিকট দশন,
হাঁ করিয়া নিদ্রা যায়, মুদিত নয়ন।
আছিল অশ্বত্থ এক মাঠের নিকট,
চড়িল তাহাতে লিঙ্গো ; হইল প্রভাত।
সারঙ্গ লইয়া লিঙ্গো ঘা দিল তাহায়,
শতরাগ তাহা হতে হইল বাহির,
তাহার সঙ্গীতে স্তব্ধ পাহাড় জঙ্গল।
সে মধুর ধ্বনি কর্ণে প্রবেশে রক্ষের।—
ঝটিতি উঠিয়া বসে রিকদ রাক্ষস,

* গোঁড়, ভিল প্রভৃতি অসভ্য জাতিরা অত্যন্ত ভীরু।

তুলিল উপরে চোখ, এদিক ওদিক
নিরখিল চারিদিক ; আসিছে সঙ্গীত
কোথা হতে, স্থির তাহা না পারে করিতে।
বলিল রাক্ষস, "কোন্ জীব কোথা হতে
আসিয়াছে আজি, ময়নার মত গীত
মধুর গাইয়া, হরি লয় মন মোর।"
এদিক ওদিক ধায়, দেখে চারিদিকে,
না পায় দেখিতে কিছু ; কভু বসিতেছে,
দাঁড়াইছে কভু, লম্ফ দিতেছে কভু বা,
গড়াগড়ি যায় কভু আরম্ভিল নৃত্য।
রাক্ষসী * প্রভাতে আসি ঘরের বাহির,
শুনিল মাঠের দিকে মধুর সঙ্গীত।
আসিয়া তথায় তার স্বামীরে ডাকিল ;
ঘন ঘন তুলি পদ প্রসারিয়া বাহু,
নোয়াইয়া ঘাড়, নৃত্যে মগন রাক্ষস,
হয়ে বাহ্যজ্ঞান শূন্য ; দেখিয়া তাহারে
উচ্চে ডাকিল রাক্ষসী—"ওরে মিন্‌ষে মোর,
বড়ই মধুর অই সঙ্গীত, রে বুড়ো,
কেড়ে লয় মন প্রাণ, আমিও নাচিব।"
এতবলি আরম্ভিল নাচিতে রাক্ষসী। †

---

* রাক্ষসী মাঠ হইতে কিছু দূরে ঘরে শুইয়াছিল।

† অসভ্যের উপরেও সঙ্গীতের ক্ষমতা এখানে উত্তমরূপে চিত্রিত হইয়াছে। গোঁড় কবির এখানে বাস্তবিক কবিত্ব দেখা যায়।

নীরবিল বীণা, গীত থামিল লিঙ্গোর;
সম্ভাষিল উচ্চে লিঙ্গো রিকদ রাক্ষসে।
বলিল রিকদ, "ভাল প্রতারিত তুমি
করেছ মোদিগে, এস, দেও আলিঙ্গন।"
আলিঙ্গিয়া বৃদ্ধে লিঙ্গো সাদরে বলিল,
"নমি আমি খুড়া তোমা।" হাত ধরাধরি
বসিল উভয়ে তবে আগুনের পাশে।
জিজ্ঞাসিল রক্ষ—"কোথা হতে বাপু তুমি,
আসিয়াছ হেথা?" "এসেছিল ভাই মোর
অগ্নির উদ্দেশে হেথা, গ্রাসিতে তাহারে
তুমি করেছিলে তাড়া; যদ্যপি গ্রাসিতে,
কোথা পাইতাম তারে এজনমে পুনঃ?"
উত্তরিল খুড়া, "হয়ে গেছে যা হবার,
করেছিনু ভুল, আছে কন্যা সাত মোর,
লয়ে যাও তাহাদিগে দিনু অনুমতি।"
সম্ভাষি রিকদে লিঙ্গো হইয়া বিদায়,
চলিল যথায় ছিল কন্যা সাত তার।
বাহিরিয়া গৃহ হতে আসি লিঙ্গো-পাশে
প্রশ্নিল সকলে তারে, "কে তুমি যুবক?
আসিয়াছ কোথা হতে, বল তা মোদিগে।"
"পিতা তোমাদের, খুড়া সম্বন্ধে আমার,
নাম মোর লিঙ্গো, ভৃত্য ঈশ্বরের আমি।
অগ্নির উদ্দেশে আমি এসেছিনু হেথা;
ক্ষুধায় পীড়িত ভাই চারি জন মোর,

রহিয়াছে বসি দূরে মোর প্রত্যাশায়।”
“ভাই তুমি আমাদের? উত্তম সম্বন্ধ!
কেমনে ছাড়িয়া চলি যাবে ভগ্নীদিগে?
লবে না মোদিগে সঙ্গে? মোরাও যাইব।”
“আসিবে যদ্যপি তবে এস শীঘ্র ক’রে।”
চলিল ভগিনী সাত লিঙ্গোর পশ্চাৎ।
লিঙ্গোর প্রতীক্ষা করি গোঁড় চারি ভাই
আছিল বসিয়া পথ নিরীক্ষণ করি;
দেখি দূর হতে তাকে, বলিল সানন্দে,—
“ভাই লিঙ্গো আসিতেছে,” উঠিল সকলে,
চাহিল লিঙ্গোর দিকে, চমকি উঠিল;
“কে ওরা লিঙ্গোর সাথে? সুন্দর উহারা!
কার কন্যাগণ সনে আসিতেছে লিঙ্গো?
দেয় যদি উহাদিগে, করিব বিবাহ।”
সম্বোধি সকলে লিঙ্গো বলিলেন তবে,—
“তনয়া ইহারা শুন খুড়ার আমার;
রাঁধিয়া যতনে সেবা কর ইহাদের।”
জ্বালাইয়া অগ্নি তবে গোঁড় চারি ভাই,
করি মাংস পাক, সুখে খাইল সকলে।
ভোজনান্তে বলিলেক লিঙ্গো ভগ্নীগণে,
“এবে ফিরি নিজ গৃহে যাও ত্বরা করি।”
উত্তরিল ভগ্নী সাত, “যাইবে যথায়,
যাইব তথায় মোরা, না ফিরিব ঘরে।”
এত শুনি বলিলেক গোঁড় চারি ভাই,—

" ভালত বলিছে এরা, স্বীকারিলে তুমি,
ভাই লিঙ্গো, মোরা সবে বিবাহ করিব।
লও বাছি সকলের সুন্দরী যে হয় ;
রবে-বাকি যারা, মোরা করিব বিবাহ
তাহাদিগে।" বলিলেন লিঙ্গো—"শুন ভাই,
নাহিক বাসনা মোর বিবাহ করিতে ;
ভ্রাতা মোর তোমা সবে, ভগিনী উহারা,
দেখিব মাতার ন্যায় আমি উহাদিগে !
বয়সে তোমরা বড়, সর্ব্বছোট আমি ;
যতন আমারে ওরা করিবে নিশ্চয় ;
আনি দিবে জল খাদ্য, করিবে প্রস্তুত
শয্যা, করাইবে স্নান, বস্ত্রাদি ধুইবে।"
"কেমনে বিবাহ লিঙ্গো করিব আমরা ?
ভাই মোরা চার, কিন্তু ভগ্নী সাত জন।"
"জ্যেষ্ঠ তিন কর বিয়ে প্রত্যেক দুজনে,
করিবে কনিষ্ঠ এক কন্যাকে বিবাহ।"
চলিল সকলে তবে কাচিকোপাগ্রামে ;
না ছিল পুরুষ তথা, না ছিল রমণী।
হরিদ্রাদি বাটি লিঙ্গো মাখাল সকলে ;
নির্ম্মিল মণ্ডপ এক, সাজাইল তায়
গাঁথি বহু পর্ণ-মালা। এরূপে সমাপ্ত
তবে হইলে বিবাহ, বলে জ্যেষ্ঠ ভাই,—
'কত উপকার লিঙ্গো করেছে মোদের ;
বিবাহের তরে আনি দিয়াছে তনয়া ;

পিতৃবৎ সম্মানিব তাহাকে আমরা ;
আহরিয়া ফলফুল আনি দিব তারে ;
শীকার আনিব ঘোর অরণ্য হইতে :
দোলানায় শুয়ে সুখে থাক্‌ লিঙ্গো ঘরে ।”
বাহিরিল চারিভাই তীরধনু হাতে,
শীকার উদ্দেশে, ঘন আঁধার জঙ্গলে ;
দোলনায় শুয়ে লিঙ্গো সুখে নিদ্রা যায় ;
গোঁড়পত্নী সাত জন দোলায় তাহারে।
এইরূপে কয় দিন হইল অতীত ।

একদা গিয়াছে বনে গোঁড় চারিজন ;
নিদ্রা যায় দোলনায়, লিঙ্গো গুরুতর ;
ভাবিল ভগিনী সাত—নাহি হাসে লিঙ্গো !
নাহি কভু কহে কথা আমাদের সনে !
না চায় মোদের পানে ! কহাইব কথা
তাকে আমাদের সনে ; হাসাইব তাকে ;
আমোদ প্রমোদ মিলি করিব সকলে।
কেহ হস্ত কেহ পদ ধরিল লিঙ্গোর ;
কেহবা দিইল টান ধরি তার গাত্র ।
তথাপি না দেখে লিঙ্গো মিলিয়া নয়ন ।
অবশেষে বলে লিঙ্গো ভগ্নী সাত জনে,
“হেন ব্যবহার কেন কর মোর সনে ?
ভগিনী তোমারা মোর নাহি কি স্মরণ ?
দাস আমি ঈশ্বরের,—যায় যাক্‌ প্রাণ,
হাসিব না তবু আমি তোমাদের সনে ;

চাহিব না তবু আমি তোমাদের পানে।”
এত শুনি জ্যেষ্ঠ ভগ্নী বলিল সকলে,—
“চাহিবে না লিঙ্গো তবে আমাদের পানে?”
এত বলি আক্রমিতে অগ্রসর তারা।
কুপিত হইল লিঙ্গো, আপাদ মস্তক
ক্রোধে হইল পূরিত; উতরিল লিঙ্গো
ক্রুত দোলনা হইতে। সম্মুখে মুদ্গর
ছিল পড়ি, লয়ে তাহা প্রহারিল সবে।
প্রহারিত ভগ্নী সাত যায় পলাইয়া।
দোলনায় ফিরি লিঙ্গো পুনঃনিদ্রা যায়;
নিজ নিজ গৃহে ফিরি গেল ভগ্নী সাত।
মধ্যাহ্ন সময়ে আসে গোঁড় চারি ভাই;
মেরেছে হরিণ কেহ কেহ খরগোস,
ময়ুর কেহ বা, ফুল আনিয়াছে কেহ;
আপন আপন বোঝা তারা নামাইয়া,
বলিল সকলে “চল, লিঙ্গোকে এখন
ভেটিব আমরা, দিব উপহার ফুল।”
দোলনায় নিদ্রাযায় দেখিয়া লিঙ্গোকে,
আপন আপন ঘরে ফিরিল সকলে।
করিয়া নিদ্রার ভাণ আছিল শুইয়া
ভগ্নী সাতজন, যেন জড়সড় ভয়ে।
জিজ্ঞাসিল সবে “কেন নিদ্রিত তোমরা?
কেননা দোলাও সবে লিঙ্গোর দোলনা?”
উত্তরিল তারা—“শুন, বলি তবে শুন;

সে পোড়া লজ্জার কথা—লিঙ্গোর আচার,
হায় কি লজ্জার কথা ! কতদিন আর
লুকায়ে রাখিব মোরা ? ছিনু এত দিন
চুপ করি—কত দিন স'ব অপমান ?
এক স্ত্রীর দুই স্বামী সম্ভবে কি কভু !
এইদণ্ডে পিতৃগৃহে ফিরি যাব মোরা।"
এত শুনি জ্বলি ক্রোধে বলে যত গোঁড় ;
"বলেছিনু মোরা 'লিঙ্গো করহ বিবাহ
সপ্ত ভগিনীর মধ্যে যারে সাধ যায়' ;
বলিল তখন ভণ্ড, পাষণ্ড, পামর,
'দেখিব ওদিকে আমি মাতার সমান' ;
শঠ লিঙ্গো প্রতারিত করেছে মোদিগে।
বনমধ্যে ছলে ধূর্ত্তে যাইব লইয়া ;
নাশি তথা তাকে, চক্ষু লইব কাটিয়া।
মারিয়াছি এত দিন হরিণ খর্‌গোস ;
নূতন শীকার মোরা করিব আজিকে।
মারিয়া তাহারে, ছিঁড়ি নিব চক্ষু দুটী ;
খেলিব সে চক্ষু লয়ে আমোদে আমরা।
এ প্রতিজ্ঞা যতক্ষণ নাহিক পূরিবে,
জলস্পর্শ ততক্ষণ কেহ না করিবে।"
চলিল সকলে তবে লিঙ্গোর সদন ;
"উঠ লিঙ্গো উঠ ভাই" বলিল সকলে।
উত্তরিল লিঙ্গো তবে, "কি হয়েছে ভাই ?
কোথা ফুল ? কোথা জল ? খালি হাতে কেন ?"

বলিল তাহারা, "এক দেখিয়াছি জন্তু
প্রকাণ্ড-শরীর, বহু মারিলাম তারে,
পড়িল না তবু, কিন্তু না যায় পলায়ে।
ক্লান্ত হয়ে শেষে মোরা এলাম চলিয়ে।"
উঠিয়া বসিল লিঙ্গো, ভাইদের পানে
বলিল চাহিয়া—'আমি মারিব সে জন্তু।"
লিঙ্গো সনে চারি গৌড় অরণ্যে চলিল;
অন্বেষিল চারিদিকে, মিলিল না জন্তু;
সম্বোধি তাদিগে তবে বলিলেন লিঙ্গো,
"গিয়াছে চলিয়া যদি, ক্ষতি নাহি তায়।"
বৃক্ষমূলে বসে লিঙ্গো বিশ্রাম আশয়ে।
বলিল তাহারা, "বস, ভাই, হেথা;
আনি দিব জল তোমা," চলি কিছু দূর,
ছুড়িল চারিটী তীর আড়াল হইতে
গৌড় চারি জন তবে লিঙ্গো লক্ষ্য করি।
সে আঘাতে বাহিরিল লিঙ্গোর পরাণ।
ছিঁড়ি লয়ে চক্ষু-দ্বয় শবদেহ হতে,
সন্ধ্যাকালে গৌড় চারি ফিরিল আবাসে।
বলিল সম্বোধি পত্নী তবে এক জন,
"জ্বাল অগ্নি শীঘ্র করে, জ্বালহ প্রদীপ;
খেলিব আমরা সবে মিলি কুতূহলে।"
হরিষে সকলে তবে হাঁটু গাড়ি বসি,
আরম্ভিল খেলিবারে চক্ষু দুটী লয়ে।

তৃতীয় ভাগ।

লিঙ্গোর পুনর্জীবন এবং গোঁড়দিগের উদ্ধার।

লিঙ্গোর শুনিয়া মৃত্যু দেব ভগবান,
দূতহাতে প্রেরিলেন অমৃত ত্বরিত।
অমৃত সিঞ্চনে লিঙ্গো পাইয়া জীবন,
জিজ্ঞাসিল দূতে, "কোথা ভাই সব মোর?"
'সে শঠ ভ্রাতার কথা করো না জিজ্ঞাসা;
সাধিয়াছে নিদারুণ শত্রুতা তাহারা;
জীবন হরিয়াছিল তাহারা তোমার;
অমৃতের বলে প্রাণ পেয়েছ আবার।
কোথায় যাইবে লিঙ্গো বল তা এখন।"
দূতের শুনিয়া কথা বলে গুরুবর,
"যাব আমি আছে যথা বন্দী গোঁড়গণ।" *
গহন কাননে লিঙ্গো চলিতে লাগিল,
উদ্ধারিতে গোঁড়-কুল সঙ্কল্প তাহার।
আসিল রজনী ঘোর-তিমির-বসনা;
বিচরে উল্লাসে ব্যাঘ্র খাদ্যের উদ্দেশে;
কুক্কুট ছাড়িল ডাক, ডাকিল ময়ূর,
শৃগালের রবে বন হইল পূরিত;
ব্যাঘ্র-ভয়ে বৃক্ষোপরে লিঙ্গোর বিশ্রাম।
নিশা অবসানে পুনঃ ডাকিল কুক্কুট;

---

* পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, মহাদেবের আজ্ঞায় সমুদয় গোঁড় (চারিজন ব্যতীত) ধবলাগিরিতে কারাবদ্ধ।

রক্তিমে রঞ্জিত পূর্ব্বে শোভিল অম্বর ;
বৃক্ষহতে নামি তবে লিঙ্গো নরবর,
করপুটে প্রণমিয়া জিজ্ঞাসে সূরযে,—
"কারকুদ্ধ কোথা, দেব, জান গৌড়গণ ?"
লিঙ্গোর শুনিয়া প্রশ্ন উত্তরে তপন,
"ব্যস্ত থাকি সারাদিন ঈশ্বরের কাযে,
নাহি জানি, লিঙ্গো, তব গৌড়ের বারতা।"
চলিতে চলিতে লিঙ্গো ভেটিলেক ঋষি,
নাম কুমায়ত তার, জিজ্ঞাসিল তারে
লিঙ্গো গৌড়ের বারতা। উত্তরিল ঋষি,—
"গর্দ্দভ সমান গৌড় অত্যন্ত নির্ব্বোধ,
অতি হেয়, খাদ্য যার বিড়াল মুষিক,
শূকর, মহিষ আরো নাম লব কত।
ধবলাগিরির এক গুহার ভিতর,
বন্দী এবে তারা সবে ; দৈত্য ভস্মাসুর
প্রহরী তথায় মহাদেবের আদেশে।"
গৌড়ের উদ্ধার শুনি মহাদেবহাতে,
তুষিতে শিবেরে লিঙ্গো আরম্ভিল তপ।
সাধিল দ্বাদশমাস সে তপ কঠোর ;
নড়িল ধবলাগিরি তাহার প্রভাবে,
নড়িল কনকাসন পিনাক-পাণির।
কোন্ সাধু রত হেন সুকঠোর তপে ?
চিন্তিল ধূর্জ্জটী হেন ; হইল বিস্মিত ;
নিষ্ক্রমিল সেইক্ষণে সাধু অন্বেষণে।

আসিয়া লিঙ্গোর কাছে, দেখিল তাহার
অস্থি-চর্ম্ম-সার, দেহে নাহি মাংসলেশ।
জিজ্ঞাসিল তারে দেব, "কি তব কামনা ?"
উত্তরিল সবিনয়ে তবে গুরুবর,—
"ছাড়ি দেও গোঁড়গণে, এই ভিক্ষা মোর।"
শুনিয়া গোঁড়ের কথা বলে মহাদেব,
"গোঁড় ছাড়া আর কিছু চাহ সাধুবর,
রাজত্ব, বিপুল ধন, যাহা ইচ্ছা যায়।"
লিঙ্গোর প্রতিজ্ঞা কিন্তু রহিল অটল;
না চাহি কিছুই আর, চাহিমাত্র গোঁড়।"
এতশুনি মহাদেব ভকতবৎসল,
গোঁড়কে করিতে মুক্ত দেন অনুমতি।
পিনাকপাণির আজ্ঞা শুনি নারায়ণ,
বিষণ্ণবদনে বলে সম্ভাষি শিবেরে;
"ভাল ছিল, বন্দী গোঁড় মরিত যদ্যপি,
হইতাম সুখী বড় আমরা সকলে।
বাহির হইলে গোঁড়, আচরিবে পুনঃ,
পূর্ব্বের মতন; কাক, শকুনী, গৃধিনী,
খাইবে অখাদ্য কত; আবার দুর্গন্ধে
পূরিবে ধবলাগিরি।" উত্তরিল শিব,
"প্রতিজ্ঞা করেছি যাহা, না হয় অন্যথা।"
এতশুনি নারায়ণ চিন্তিল উপায়,—
"বিন্দোনামে আছে পক্ষী সমুদ্রের তীরে,
আনিতে যদ্যপি পার শাবক তাহার,

পাইবেক মুক্তি, লিঙ্গো, তবে গোঁড়গণ।”
“তথাস্তু” চলিল লিঙ্গো সাগর সন্নিধে ;
হেরিল তথায় পক্ষীশাবক দুইটী।
বড় ভয়ঙ্কর সেই বিন্দো-বিহঙ্গম ;
বিনাশি গজেন্দ্র, চক্ষু খাইত তাহার,
মাথার মগজ আনি দিইত শাবকে।
বিহঙ্গ বিহঙ্গী গেছে খাদ্য-অন্বেষণে,
কুলায় শাবকে লিঙ্গো পাইল দেখিতে ;
মনে মনে বিবেচিল ধার্ম্মিক প্রবর,—
লয়ে যাই যদি এবে বিন্দোর শাবক,
তস্করের পাপে আমি হব কলুষিত ;
অতএব যতক্ষণ বিহঙ্গ বিহঙ্গী
নাহিক আইসে ফিরি, রহিব হেথায়।
হেন কালে নাগ এক ভীষণ মূরতি,
স্থূল যেন বৃক্ষশুঁড়ী, বিস্তারিয়া ফণা,
সমুদ্র হইতে আসি হেলিয়া দুলিয়া,
ভক্ষিতে শাবকদ্বয়ে হয় অগ্রসর।
ত্রাসিত তাহারা উচ্চে করিল ক্রন্দন।
যোজিয়া ধনুকে লিঙ্গো তীক্ষ্ণ শর তবে,
নাশি নাগে সপ্তখণ্ড করিল তাহায়।
বিহঙ্গম বিহঙ্গমী এমন সময়ে,
প্রত্যাগত বন হতে খাদ্য নানা লয়ে।
জননী হস্তীয় ওষ্ঠ আর চক্ষুদ্বয়
সযত্নে সন্তানে দেয় ভক্ষণের তরে।

নাহি খায় বাছা কিন্তু কিছুই তাহার ;
তাহা দেখি জননীর উপজিল দুঃখ ;
সম্ভাষি স্বামীকে তবে বলিতে লাগিল,—
" না জানি খায় না বাছা কিসের লাগিয়া ;
বুঝি বা দিয়াছে দৃষ্টি কোন দুষ্ট জন।"
প্রিয়ার বচন শুনি বলে বিন্দো পক্ষী,
" দেখহ মনুষ্য এক বসি বৃক্ষতলে,
মারিলে মধুর খাদ্য হবে বাছাদের।"
শুনিয়া পিতার কথা বলিছে শাবক,—
" একাকী মোদিগে হেথা রাখিয়া তোমরা,
অরণ্যে চলিয়া যাও খাদ্য-অন্বেষণে ;
কে করিবে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ ?
সমুদ্র হইতে নাগ এসেছিল এক ;
যদি না থাকিত অই মনুষ্য হেথায়,
যাইত নাগের হাতে জীবন নিশ্চয়।
ভোজন করাও অগ্রে জীবনরক্ষকে :
তার পর খাদ্য মোরা খাইব হরিষে।"
বিহঙ্গিনী শুনি তবে শাবক-বচন,
উতরিয়া দ্রুতগতি লিঙ্গোর সদন,
হেরিল সপত খণ্ডে নাশিত ভুজঙ্গ।
সকৃতজ্ঞে বলে তবে লিঙ্গোসাধুবরে,—
" সাতবার করিয়াছি সন্তান প্রসব,
সাতবার নিঃসন্তান করিয়াছে নাগ ;
যদি না থাকিতে আজ, নরশ্রেষ্ঠ, হেথা,

হারাইত অভাগিনী আজিকে শাবক।
উঠ, ভাই, উঠ পিতা, বল কোথা হতে
আসিয়াছ তুমি, কিবা বাসনা তোমার?"
উত্তরিল লিঙ্গো—"যোগী আমি শুন, বিন্দো,
শাবক লইতে তব এসেছিনু হেথা।"
লিঙ্গোর বাসনা শুনি কাঁদয়ে বিহঙ্গী,—
"যাহা চাও তাহা দিব, কিন্তু এ মিনতি,
চাহিওনা বাছাদিগে লয়ে যেতে সাধু।"
বিহঙ্গীর কান্না দেখি আশ্বাসিল লিঙ্গো,
"দেখাইতে মাত্র শিবে লইব শাবক।"
লিঙ্গোর বচন শুনি আনন্দিত বিন্দো;
"দেখাইতে মহাদেবে শাবক আমার,
সানন্দে তোমার সঙ্গে যাব সাধুবর।"
এত বলি বিহঙ্গমী পক্ষের উপর,
লইল লিঙ্গোকে আর শাবক তাহার।
তাহা দেখি বিবেচিল বিন্দো বিহঙ্গম,—
একাকী এ শূন্য গৃহে কি ফল থাকিয়া;
সম্বোধি লিঙ্গোকে তবে বলিল বিহঙ্গ,—
"সূর্য্যের উত্তাপে কষ্ট পাবে সাধুবর,
অতএব যাব আমি আবরি তোমায়।"
বিন্দো সঙ্গে দেখি লিঙ্গো মহাদেব বলে,
"লিঙ্গোর অসাধ্য ক্রিয়া নাহিক জগতে,
জানিতাম লিঙ্গো লয়ে আসিবে শাবক।
লয়ে যাও গৌড় তব দিনু অনুমতি।"

কারামুক্ত গোঁড় তবে হইয়া বাহির,
প্রণমিয়া বলে " লিঙ্গো, গোঁড়ের রক্ষক,
তোমা বিনা আমাদের কেহ নাহি আর।"

চতুর্থ ভাগ।

গোঁড়দিগের গোত্র-বিভাগ ও দেবতা-পূজা।

কাটিয়া জঙ্গল গোঁড় নিরমিল গৃহ,
ক্রমশঃ হইল গ্রাম "নরভূমি" নাম।
ক্রমশঃ তথায় হাট বসিতে লাগিল;
ক্রমশঃ কৃষক পায় বলদ, শকট। *
একদা লিঙ্গোকে বেষ্টি বসিয়াছে সবে,
সম্বোধি তাদিগে গুরু বলিতে লাগিল,—
"না বুঝ কিছুই শুন, হে গোঁড়, তোমরা;
না জান কে ভাই, নাহি জান পিতা কেবা;
নাহি জান কার সনে বিবাহ বিধেয়।"
উত্তরিল নম্রভাবে সভাস্থ সকলে,—
"সত্য কথা বলিয়াছ, গুণের সাগর!
তোমার মতন জ্ঞান আছে বল কার?

* অর্দ্ধসভ্য প্রদেশে রীতিমত বাজার থাকে না; কোন বড়গোছের গ্রামে নির্দ্দিষ্ট দিনে হাট হয়। সেই হাটে নিকটস্থ পল্লীসমূহের স্ত্রীপুরুষেরা ক্রয় বিক্রয়ার্থ আসিয়া থাকে।

কৃষিকার্য্যের প্রথমাবস্থায় বলদের প্রয়োজন হয় না, সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে লাঙ্গল ও বলদ ব্যবহৃত হয়।

জাতিতে বিভাগ লিঙ্গো কর আমাদিগে।”
লিঙ্গোর আদেশে গোঁড় হয় অষ্ট গোত্র।
অতঃপর বলে লিঙ্গো, “শুন ভাইগণ!
ঈশ্বরের কভু মোরা না পাই দর্শন;
অতএব এস মোরা নির্ম্মিব দেবতা,
সকলে মিলিয়া পূজা করিব তাঁহার।”
একস্বরে গোঁড় সবে দিইলে সম্মতি,
লিঙ্গো বলে, “আন হেথা ছাগের শাবক,
আনহ মোরগ এক, গাভি বৎস আর।
রচিবেক কর্ম্মকার লৌহের মুরতি,
ফর্শাপেন নাম সেই পাইবে দেবতা;
আহরি অরণ্য হতে আন কাষ্টখণ্ড,
কাষ্টদেব বলি তারে পূজিবে সকলে;
দেবতা আরেক শুন ঘণ্টার শৃঙ্খল,
চামর হইবে শুন দেবতা চতুর্থ।” †

ইহার পর দেবতাদিগের পূজা বর্ণিত হইয়াছে; তাহার প্রধান অঙ্গ মদ্যপান, আমোদ প্রমোদ ও বলিদান। পঞ্চম খণ্ডে গোঁড়কবি বিবাহপদ্ধতির বর্ণনা করিয়াছেন। এসকল বিষয় পাঠকের নিকট সম্ভবতঃনীরস বোধ হইবে বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।

---

† গোঁড়ের ন্যায় অসভ্য জাতির দেবতাসমূহের এরূপ উৎপত্তি চতকটা হাস্যজনক হইলেও শিক্ষাদায়ক।

ফুলের প্রতি।

বাগানের ফুল! গোলাপ! বেল! তোমার হাসিতে তত আহ্লাদ হয় না। তাহাতে কেমন যেন কিসের অভাব আছে বলিয়া বোধ হয়। তাহাতে তত মধুরত্ব নাই, তত রস নাই। বাগানের ফুল! হাস তুমি, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নহে। তোমার হাসি কতকটা কৃত্রিম; তাই হৃদয়ভরা নহে; তাই তাহাতে তত আনন্দ পাই না। যে হাসিতে বাধ্য, তার হাসি কাহাকে উল্লসিত করে? জন্ম যার কেবল আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য, তার প্রীতিকর কার্য্যে কে বিশেষ প্রীত হয়? চিরভৃত্যের প্রভুচর্য্যা কোন প্রভুকে হৃদয় ভরিয়া সুখ দেয়?

বাগানের ফুল! তুমি দাস, চিরদাস। তোমার জীবন মরণ আমাদের হাতে। মানুষ যদি তোমায় আজ ত্যাগ করে, কাল তোমার দশা কি হইবে? শুকাইবে, মরিয়া যাইবে। যাহারা পরাধীন, চিরভৃত্য, পরের সাহায্য ব্যতীত অনন্যগতি, পরিণাম তাহাদের বুঝি এই প্রকারই হইয়া থাকে!

তোমার অতুল সৌন্দর্য্যের ছটা দিক্ আলো করে। কিন্তু সে সৌন্দর্য্যে হৃদয়ের পরিতৃপ্তি হইবে কি, বরং কিছু দুঃখ হয়। তোমায় আমরা সাজাইয়াছি তোমার অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গের হানি করিয়া। অই যে তোমার পাপ্ড়ির উপর পাপড়ি, তার উপর পাপ্ড়ি, কত দল পাপ্ড়ি শোভা পাইতেছে। ঐ শোভা কি তোমার বাঞ্ছনীয়? উহা কি তুমি কামনা কর? স্বাধীনতা

থাকিলে কি উহা ধারণ করিতে ? না। তুমি ঐ পাপ্‌ড়ির বাহার পাইয়াছ কেশরের বিনিময়ে। কেশর পুষ্পের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ, পুষ্পের পুষ্পত্ব। তাহা তুমি হারাইয়াছ যে সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত, সে সৌন্দর্য্য নিশ্চয়ই তোমার চক্ষের শূল। পাপ্‌ড়ির কাজ মুকুলে কেশরকে রক্ষা করা, বিকসিত কুসুমে নিষেক ক্রিয়ার সহায়তা করা। যখন তোমার কেশর বিনষ্ট হইল, তখন পাপ্‌ড়ির শোভা বৃদ্ধি তোমার পক্ষে ঘোর বিড়ম্বনা, হৃদয়ভেদী বিদ্রূপ। স্বাধীনতার বিনিময়ে, হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিনিময়ে কে বহুমূল্য, চাক্‌চিক্যশালী পরিচ্ছদের প্রার্থনা করে ? বেশভূষা যার জন্য, তাহাই যদি না থাকিল, তবে বেশভূষা নিঠুর উপহাস মাত্র।

সহরের ফুলে, বাগানের ফুলে, সৌন্দর্য্য-পিপাসা মিটে না। সে পিপাসা মিটে, কোথায় ? বনে, প্রকৃতির রাজ্যে। বাগানের ফুল সাজে মানুষের ইচ্ছায়, মানুষের সাধে। বনের ফুল সাজে প্রকৃতির আজ্ঞায়, প্রকৃতির জন্য। তাই বনফুলের শোভা এত ভাল লাগে। তাই বন্যবৃক্ষ, বন্যলতা, বন্যফুল, বন্য-যাহা কিছু-সুন্দর তাহাই দেখিতে এত ভালবাসি। সে দৃশ্য পুরাতন হয় না। যত দেখিবে, ততই দেখিতে ইচ্ছা বাড়িবে।

বন্য গোলাপ ! প্রকৃতির গোলাপ ! বাগানের গোলাপের ন্যায়, মানুষের গোলাপের ন্যায়, দেখিতে তুমি তত সুন্দর নও, সত্য। তোমার একদল বই পাপ্‌ড়ি নাই, তাও আবার ছোট ছোট। বাগানের গোলাপের কতদল পাপ্‌ড়ি—বড় বড় পাপ্‌ড়ি। কিন্তু, বনগোলাপ ! তুমি স্বাধীন। সকল প্রাণীই যাহার অধীন সেই প্রকৃতি ব্যতীত আর কাহারও অধীনতা

মান না। তোমার হাসিতে কেমন যে একটু স্বাস্থ্যব্যঞ্জক লালিত্য, স্বাধীনতা-সুলভ মাধুর্য্য এবং মহত্ত্ব আছে, তাহা অবক্তব্য। সে লালিত্য, সে মাধুর্য্য, সে মহত্ত্ব, পরাধীনে, চিরদাসে, কারারুদ্ধে সম্ভবে না। বনফুল! তোমার সৌন্দর্য্য যে চক্ষুর ক্ষণিক প্রীতি উৎপাদনের জন্য, তাহা নহে। সে সৌন্দর্য্যের মর্ম্ম আছে, উদ্দেশ্য আছে। তুমি নানা বর্ণে রঞ্জিত, চিত্রিত বিচিত্রিত হও—হরিদ্রা, সাদা, নীল, লাল, বেগুনে, কত বর্ণের নাম করিব? মানুষের ভাষা হার মানে। বাগানের ফুলেরও ঐরূপ বিবিধ বর্ণ দেখিতে পাই। কিন্তু সে বর্ণের অর্থ নাই—কেবল নয়নরঞ্জক শোভা, কেবল বাহার! বন-ফুল! তোমার বিশেষ বিশেষ বর্ণের বিশেষ অর্থ আছে, গভীর তত্ত্ব আছে, সহস্র সহস্র বৎসর ব্যাপী ইতিহাস আছে। সে অর্থ বুঝিতে, সে তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে সে ইতিহাসের কল্পনা করিতে কি সুখ হয়!

পলাশ! তোমার গাঢ় লাল ফুল বন আলো করিয়াছে। সৌখীন পতঙ্গাদি আকৃষ্ট হইতেছে; ঝাঁকে ঝাঁকে আসিতেছে। পলাশ! তোমার শোভা সার্থক। কারণ তাহাতে ফল হয়; সেই ফলে বীজ জন্মে; সেই বীজে বংশবৃদ্ধি হয়। বাগানের ফুলের শোভা নিরর্থক, নিষ্ফল।

বন-ফুল! কত বিপদ আপদ অতিক্রম কর, বাধা প্রতিবন্ধক ঠেলিয়া উঠ, নিজের বলে। বাগানের ফুলের তাহা করিতে হয় না, সে শক্তিও নাই। সার দিয়া, জল দিয়া, কত যত্ন করিয়া, তাহাকে বড় করিতে এবং বাঁচাইয়া রাখিতে হয়। তাই, সে এত দুর্ব্বল; তাই, একটু অযত্নেই তাহার

আয়ুঃশেষ হয়। বন-ফুল! তোমার জীবনসংগ্রাম কি ভয়ানক ব্যাপার? বাগানের ফুলের সে সংগ্রাম নাই, সে সংগ্রাম-জনিত শক্তি এবং বলও নাই। দুঃখ কষ্টে না পড়িলে, যন্ত্রণা ভোগ না করিলে, শত্রুর সহিত না যুঝিলে কি কাহারও বল হয়? বন-ফুল! তোমাদের প্রত্যেকের কত শত্রু! তোমাদের প্রত্যেককে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে হয়। তাই, এত তেজ, এরূপ কান্তি, এমন স্ফূর্ত্তি।

সৌন্দর্য্যশালি, সুরভি বন-কুসুম! তোমার সৌভাগ্য। কত শত বনের মক্ষিকাদি তোমার কাছে পালে পালে আসিতেছে। তোমার অপর্য্যাপ্ত বীজোৎপাদনের উপায় করিতেছে। জীবনসমরে তোমার জয়ের আশা বাড়িতেছে।

কিন্তু, বীজোৎপাদন সংগ্রামের শেষ নহে। চারা জন্মিল, অন্যান্য ফুলের চারা তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। বন্য জন্তু আসিয়া তাহার সুকোমল অঙ্গে আঘাত করিল। এত বিঘ্ন সত্ত্বেও যে কতকগুলি সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, সে নিজের গুণে, নিজের বলে। এত ফাঁড়া কাটিয়া যে বাঁচিয়া উঠে, প্রকৃতির এরূপ কঠোর পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয়, তাহার বল, তেজ, না হইবে কেন?

হিমালয়ে একটি নীহার-বাহুর পার্শে।

হিমালয়ে উঠিতে উঠিতে প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা যায়! সমতল বঙ্গভূমির পরিবর্ত্তে, এখানে গভীর উপত্যকাময় পার্ব্বত্য প্রদেশ। একদিকে, উপত্যকায় ছয় সাত হাজার ফুট নীচে কল্লোলিনা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া ছুটিতেছে, অন্য দিকে ছয় সাত হাজার ফুট উচ্চ হইতে জলপ্রপাত বা তুষারপাত হইতেছে। বঙ্গে যেমন গরম এখানে তেমনি শীত। বঙ্গে যা আছে, এখানে তা নাই। এখানে যা আছে বঙ্গে তা নাই! বঙ্গের মল্লিকা, মালতী, যুথী এখানে ফুটে না। এখানকার কুসুমসুন্দরীদিগের নাম বাঙ্গলা ভাষায় পাই না, ইংরাজি নামে ডাকিতে হয়। এখানকার ফল ফুল ইউরোপীয়—অথচ বঙ্গদেশ এখান হইতে প্রায় দেখা যায় বলা যাইতে পারে।

হিমালয়ের ভিতর উচ্চতার প্রভেদে, উদ্ভিদ্ সংস্থানের আশ্চর্য্য প্রভেদ দেখা যায়। এমন কি গাছ দেখিয়া কত উচ্চে উঠিয়াছি আন্দাজ করা যায়। হিমালয়ের পদতলে শালবন। দার্জ্জিলিংয়ের নিকট ওক, চেসনট, প্রভৃতি বড় বড় গাছ। আরও উচ্চে রডোডেণ্ড্রন, ফার প্রভৃতি গাছ দেখা যায়। তার চেয়ে উচুতে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুগন্ধ রডোডেণ্ড্রন প্রভৃতি গাছ! এখানে (নীহার-বাহুর পাশে) ঘাস এবং অতিশয় ক্ষুদ্র ২। ৪ রকমের ফুল ব্যতীত আর কিছুই জন্মে না। ইহার উপর সব বরফ, সেখানে জীবনের লেশমাত্র নাই। যে যেখান-

কার যোগ্য তাহাকে সেইখানে দেখা যায়! অথবা যাহাকে যেখানে দেখা যায়, সে সেখানকার উপযুক্ত না হইলে, সেখানে তিষ্ঠিতে পারিত না। প্রকৃতির এই আশ্চর্য্য নির্ব্বাচনী শক্তির এখানে একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা যায়। ফারকে শালের স্থানে রোপণ কর মরিয়া যাইবে, শালকে ফারের স্থানে রোপ কর মরিয়া যাইবে।

পাশে একটি নীহারবাহু বা বরফের নদী। বর্ষাকালে পদ্মা বা ব্রহ্মপুত্র যেরূপ প্রশস্ত হয়, সেইরূপ প্রশস্ত একটি নদী মনে করিয়া লও। নদীর জলের পরিবর্ত্তে বরফ—পাথরের মত শক্ত বরফ মনে কর, তাহা হইলে এই বরফনদী বা নীহারবাহু কি কতকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে। উহা ছোট বড় বিবিধ প্রস্তরখণ্ড বক্ষে করিয়া আস্তে আস্তে চলিতেছে—এত আস্তে যে, দেখিলে উহা যে চলিতেছে তাহা বোধ হয় না। ঐ অভ্রভেদী গিরিশৃঙ্গে যে তুষার পড়ে তাহা জমাট বাঁধিয়া বরফ হয়, সেই বরফরাশি নদীর আকারে নিম্নস্থানে নামিয়া থাকে। নহিলে, বৎসরের পর বৎসর তুষার জমিয়া ঐ শৃঙ্গ যে কত উচ্চ হইত বলা যায় না; এবং ঐ তুষার রাশি কোনই কাজ করিত না। প্রকৃতির রাজ্যে অপচয় নাই; জড়ই বল আর প্রাণীই বল কোন পদার্থ চুপ করিয়া বসিয়া থাকে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুষারকণারও জীবন ব্যর্থ নয়। উহারা একত্র হইয়া আট, নয় হাজার ফুট উপর হইতে বরফ নদীর আকারে এখানে নামিয়াছে। বরফনদী আর কিছুদূর নীচে গিয়া একটি বেগবতী স্রোতস্বতীকে জন্ম দিয়াছে।

কল্লোলিনী হাসিয়া হাসিয়া, লাফাইয়া লাফাইয়া ছুটি-তেছে। চারিদিক হইতে আরও কত ভগিনী আসিয়া তাহার সঙ্গে মিলিল। সকলে মিলিয়া, একত্র হইয়া, হাসিয়া খেলিয়া, নাচিয়া, উচ্চতানে গান গাহিয়া চলিতেছে। শুঁড়ি পাথর ইত্যাদি সম্মুখে যা কিছু বাধা প্রতিবন্ধক পড়িতেছে, তাহা সগর্ব্বে ঠেলিয়া ফেলিতেছে, চূর্ণ করিতেছে। কি তেজ, কি বীর্য্য, কত স্ফূর্ত্তি, কত আনন্দ! দৃশ্য অতি মনোহর! জীবনের প্রারম্ভে এইরূপই হইয়া থাকে। নদি! আরও কিছুদূর যাও, বয়স একটু বাড়ুক, এত লাফালাফি এত তেজ রহিবে না, এত উচ্চে হাসিবে না, এত উচ্চে গাহিবে না। কিন্তু তখন তোমার আর এক মূর্ত্তি দেখিতে পাই। সে মূর্ত্তিও কি সুন্দর। সে মুর্ত্তি, ধীর, গভীর, প্রশান্ত। এখন তুমি উগ্রা, করালিনী! তখন তুমি প্রেমময়ী লক্ষ্মী। তোমার এই উগ্রমূর্ত্তিও সৌন্দর্য্য-শালী; কিন্তু এ সৌন্দর্য্যে ভালবাসার উদ্রেক হয় না, বরং ভয় হয়। বয়োধিক্যের সহিত তোমার যে মূর্ত্তি হয় তাহা দেখিলে কেমন যেন ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, কারণ, তখন তুমি পরোপকারে ব্রতী! এখন, তোমার কাছে কোন জীব তিষ্ঠিতে পারে না। তখন, তুমি কত জীবকে ক্রোড়ে স্থান দিবে, লালন পালন করিবে, কত জীবকে বাঁচাইয়া রাখিবে। এখন তুমি কেবল ধ্বংশ করিতেছ, বড় বড় পাথরকে ছোট ছোট নুড়ি করিতেছ, ছোট ছোট পাথরকে মৃত্তিকাকণায় পরিণত করিতেছ। তখন তুমি কৃষকের ক্ষেত্রে পলি দিবে, ক্ষেত্রের উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইবে, কৃষিকার্য্যের সুসার করিবে। তখন কত লোকের জীবন তোমার উপর নির্ভর করিবে।

তখন লোকের আবাসযোগ্য কত নূতন নূতন জমি প্রস্তুত করিবে। এখন তুমি পৃষ্ঠে যদি কোন বোঝা বহ ত তাহাকে চূর্ণ করিবার জন্য। তখন তুমি পৃষ্ঠে কত বোঝা বহিয়া বাণিজ্যের সহায়তা করিবে। এক কথায়, এখন তুমি নিতান্ত স্বার্থপর, তখন পরের হিতই তোমার ব্রত হইবে।

অসংখ্য জীবের অশেষ হিত করিয়া পরে তুমি অনন্ত সাগরে মিশিবে। তখন দৃশ্যতঃ তোমার জীবনের শেষ হইল বটে, নদীর নদীত্ব গেল বটে কিন্তু তখনও বাস্তবিক তোমার মৃত্যু হইল না, মহাসমুদ্রে বিলীন হইলে মাত্র। মহাসমুদ্র তোমার জন্মদাতা। তিনি আপনার শরীর হইতে জলীয়বাষ্প হিমালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন। ঐ জলীয়বাষ্প উচ্চশৃঙ্গে তুষাররূপে সংহত হইয়াছে। তুষাররাশি এই বরফনদীর আকারে নামিয়াছে। এই বরফ হইতে তোমার জন্ম। তোমার জীবনের শেষ হইলে জন্মদাতার ক্রোড়ে লুকাইলে।

নদি! তোমার জীবন আদর্শ জীবন, মানব জীবনের সহিত অনেকটা সৌসাদৃশ্য আছে। কিন্তু তোমার জীবনের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যেরূপ স্বচক্ষে দেখিতে পাই, মানব জীবনের আদি অন্ত সেরূপ দেখিতে পাই না। মানবজীবনেরও কি বাস্তবিক ক্ষয় হয় না? তোমার মত কোন অনন্তসাগরে মিশিয়া যায়? ক্ষুদ্র মানবাত্মা অনন্তাত্মায় বিলীন হয়? তোমার জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যেরূপ আমরা দেখিতে পাই, সেইরূপ মানুষ অপেক্ষা উচ্চ জীব কি মানব জীবনের আদি অন্ত দেখিতেছে?

কবিবর কালিদাস হিমালয়কে দেবতাত্মা বলিয়াছেন। দেবতার বাঞ্ছনীয় স্থান বটে। হিমালয়ের মত দৃশ্য বোধ হয় যেন আর কোথাও নাই। এখানকার দৃশ্য নানারূপ। কোথাও নিবিড়ারণ্য—বড় বড় বৃদ্ধ শৈবালাবৃত বৃক্ষ; তাহাকে প্রণয়িণীলতা জড়াইয়া রহিয়াছে, যেন তাহার সঙ্গে একাত্মা হইয়াছে, মৃত্যু হইলে এক সঙ্গে মরিবে, তার আগে ছাড়িবে না। ছোট, বড়, সরু, মোটা, লম্বা, চৌড়া কত রকমের ফার্ণ শোভা পাইতেছে। কত রকমের ফুল হাসিতেছে। কত রকমের পাখী গাহিতেছে। কোথাও পাৎলা জঙ্গল; ছোট ছোট বাঁশ, তার অতি সরু সরু পাতা; রডোডেণ্ড্রনের লালফুলে লালে লাল হইয়াছে। কোথাও সুগভীর উপত্যকা, যেন অতলস্পর্শ বলিয়া বোধ হয়, তাহার ভিতর রজতহারের ন্যায় একটি নদী। কোথায় বেগবতী স্রোতস্বতী ভীষণবেগে ছুটিতেছে। কোথাও তুষারাবৃত শুভ্রশির উচ্চশৃঙ্গ গগনভেদ করিয়া উঠিয়াছে। তাহাতে সূর্য্যোদয়ে, বা সূর্য্যাস্তে, বা চন্দ্রালোকে কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের খেলা!

এখানকার (এই নীহারবাহুর পাশের) দৃশ্যও অতি সুন্দর। এ সৌন্দর্য্যে গাম্ভীর্য্য এবং মহত্ত্ব মিশ্রিত। এখানকার সকলই মহৎ। শত বজ্রধ্বনির শব্দে সহস্র সহস্র ফুট উচ্চ হইতে ভীষণবেগে তুষারপাত হইতেছে। তুষারমণ্ডিত অত্যুচ্চ-শৃঙ্গসমূহ গগনভেদ করিয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে। সেখান হইতে বিশাল নীহারবাহু প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড বক্ষে করিয়া নামিতেছে। অদূরে, কল্লোলিনী ভীষণবেগে, ভীষণ গর্জ্জনে ছুটি-

তেছে। এখানকার সকলই মহৎ, ক্ষুদ্র কেবল একটি মানুষ, যাহার স্থান এখানে নহে।

এ স্থান দেবতার স্থান। একবার যেন স্বপ্নের মত বোধ হইল এ স্থান স্বর্গ। সশরীরে স্বর্গে আসিলাম! অচিরে স্বপ্ন ভাঙ্গিল। কে যেন বলিল, মানুষ, স্বর্গ কি উচ্চে, না সুন্দর দৃশ্যে? স্বর্গ যে ভূমণ্ডলব্যাপী। সশরীরে স্বর্গলাভ করা যায়, অন্ততঃ স্বর্গলাভ করিতে চেষ্টা করা যায়, যেখানে সেখানে। স্বর্গ কোথায়? মনের ভিতর। এস্থান সুন্দর, পবিত্র, মহৎ। কিন্তু কথায় বলে "ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।" যার মন দেবতুল্য হয় নাই, সে স্বর্গতুল্য স্থানে গেলেও দেবতা হয় না, যেমন তেমনি থাকে। যার মন দেবসদৃশ, সে নরকে গেলেও সেখানে স্বর্গসুখ ভোগ করে। বাহ্যদৃশ্যের সহিত মনের নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে, সত্য। এখানে যেরূপ সৌন্দর্য্যের, মহত্ত্বের ছড়াছড়ি, তাহাতে কার মন না অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্য সুন্দর, মহৎ, দেববৎ হয়। কিন্তু কতক্ষণের জন্য? আবার যে সেই। কয়েক দিন উপরি উপরি দেখ, এমন যে সুন্দর দৃশ্য, যাহা দেখিয়া, অনুপম, অবর্ণনীয়, ইত্যাদি কত বিশেষণ মুখে আসিতেছে, তাও যেন পুরাতন বোধ হইবে, ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া যেন সৌন্দর্য্য হারাইবে। বাস্তবিক কি উহার সৌন্দর্য্য অনেকটা নূতনত্বে নয়? হিমালয়ের রডোডেণ্ড্রন এবং ফার-বন, সুগভীর উপত্যকা, বেগবতী কল্লোলিনী, তুষারমণ্ডিত তুঙ্গশৃঙ্গসমূহ ছাড়িয়া একবার সমতল বঙ্গে যাও। সেখানে, সন্ধ্যার পর একটি দীঘির পাশে, বড় বড় অশ্বত্থ গাছের ছায়া চন্দ্রালোকে হেলিয়া দুলিয়া

খেলিতেছে। অসংখ্য জোনাকিপোকা উঠিতেছে, নামিতেছে, ঘুরিতেছে—সে দৃশ্য কি মনোহর নয়? প্রথম, কি অনেক দিন পরে দেখিলে, সেখানেও মনে অনির্ব্বচনীয় সুখ হয় না? সেখানেও কি সশরীরে স্বর্গে যাওয়া যায় না? যায়—সুখ মনে, স্বর্গ মনে।

সমাপ্ত

Printed by I. C. Bose & Co, Stanhope Press, 249, Bow-Bazar Street, Calcutta.